শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত

বিজ্ঞানাঙ্গন

সংখ্যা ৫ - বর্ষ ১ মার্চ ২০২১

কালপুরুষ

কোভিড-১৯

অ্যাপ রিভিউ

পাই-এর গল্প

ইঞ্জিন

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত

বিজ্ঞানাঙ্গন

বর্ষ ১ · সংখ্যা ৫
মার্চ ২০২১
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭ · রজব-শাবান ১৪৪২

সম্পাদক
ইসরাতুল মারিয়া
সহ-সম্পাদক
তামরীন জাহান, মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

প্রচ্ছদ
মীর অম্লান, মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল
ডিজাইন ও লেআউট
শিফাজ আহমেদ, মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল
সমন্বয়কারী
মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল
ওয়েবসাইট সঞ্চালক
নিয়াজ আহমেদ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল, শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব
শিক্ষা ওয়েব প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত। © ২০২০ শিক্ষা ওয়েব। প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল: মার্চ ২৯, ২০২১ (বুধবার)
মূল্য: বিনামূল্য (০০ টাকা)

অনেক অপেক্ষার পরে আমাদের দ্বিমাসিক ম্যাগাজিনটি ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবারের মত এবার শুক্রবার প্রকাশ করা হচ্ছে না। তবে মাসের শেষ দিনেই প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি প্রতি বারের মতো এবারও ম্যাগাজিন টি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে।ম্যাগাজিনটি তৈরির পিছনে কিছু মানুষের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাদের প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা।

এবারের সংখ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক, তাই জ্যোতির্বিজ্ঞান এর বিভিন্ন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে আপনাদের কাছে আমরা হাজির ম্যাগাজিনটি নিয়ে।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের পাশে থেকে আমাদের পথচলা কে আরও এগিয়ে নেবেন, এটাই আশা রইল।

- ইসরাতুল মারিয়া
সম্পাদক, বিজ্ঞানাঙ্গন

ইমেইল: editor@bigganangon.shikkhaweb.com
ওয়েবসাইট: https://bigganangon.shikkhaweb.com
পেইজ: https://www.facebook.com/SWBigganangon
বিজ্ঞান ক্লাবের ওয়েবসাইট: https://scienceclub.shikkhaweb.com
বিজ্ঞান ক্লাবের পেইজ: https://www.facebook.com/ShikkhaWebSC
বিজ্ঞান ক্লাবের গ্রুপ:
https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWebSC

নেবুলা
নাবাইল আহমেদ নির্ঝর ১৪

ভিপিএন কি, কিভাবে কাজ করে এবং কেন ব্যবহার করব?
মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল ১১

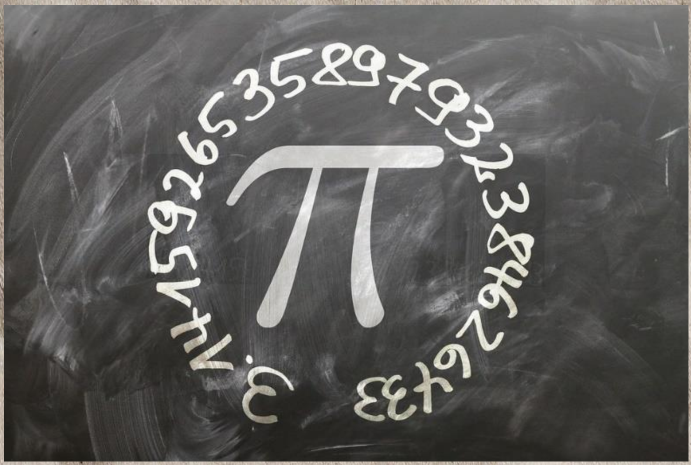

পাই দিবস
নিয়াজ আহমেদ ২৭

ফিচার

ইঞ্জিন ০৯
আইওটি নিয়ে অনুসন্ধান ২৪
দ্য এইজ অব এআই ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

পদার্থবিজ্ঞান ২৯
জ্যোতির্বিজ্ঞান
কালপুরুষ ২১
শ্বেত গহ্বর ৪৩
গণিত ৩৯
বই রিভিউ ২০
প্রযুক্তি ৩২
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ১৭

বিজ্ঞানাঙ্গন ম্যাগাজিনে লেখা দিতে আগ্রহী?

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. লেখা সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় হতে হবে। কোন প্রকার কপি থাকলে লেখা প্রকাশিত হবে না।

২. লেখা ৮০০-১,১০০ শব্দের হতে হবে।

৩. দুটো লেখা পাঠাতে হবে। সেখান থেকে বাছাই করে এক সংখ্যায় একটি কিংবা দুটিই প্রকাশিত হতে পারে।

৪. বিজ্ঞান সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে (যেমন: পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, প্রযুক্তি, অণুজীববিজ্ঞান ইত্যাদি) লেখা যাবে।

৫. লেখাকে ওয়ার্ড ফাইলে (.docx) পাঠাতে হবে। ফরম্যাটিং করার প্রয়োজন নেই। সাথে ছবি সংযুক্ত করতে হবে। তবে কেউ যদি ওয়ার্ড ফাইল তৈরি করতে সক্ষম না হন, তিনি ইমেইলে টেক্সট আকারে লেখা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে সাথে প্রয়োজনীয় ছবিও পাঠাতে হবে।

৬. লেখার শেষে এক বা একাধিক সূত্র দিতে হবে যেন আমরা আপনার লেখা যাচাই করতে পারি। সূত্র ব্যাতিত লেখা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

৮. লেখা পূর্বে কোথাও (ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে) প্রকাশিত হওয়া যাবে না।

লেখা পাঠানোর জন্য করনীয়:

আমাদেরকে আপনার লেখাটি ওয়ার্ড ফাইল আকারে অথবা টেক্সট আকারে editor@bigganangon.shikkhaweb.com এই ইমেইল অ্যাড্রেসে পাঠাতে হবে। সাথে আপনার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলের নাম, ডিপার্টমেন্ট বা গ্রুপের নাম, সেশন, ফেসবুক অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক এবং মোবাইল নাম্বার পাঠাতে হবে। আপনার লেখা পাওয়ার পর এবং সিলেক্ট হওয়ার পর আপনাকে মেইল করে জানানো হবে।

নোট: সম্পাদকমণ্ডলী যেকোনো লেখা গ্রহণ কিংবা বাতিল উভয়েরই অধিকার রাখে। এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

দাবি পরিত্যাগ

আমাদের ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল লেখা আমাদের কপিরাইটে থাকলেও, ব্যবহৃত ছবিগুলো আমাদের নয়। সেগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা। সেক্ষেত্রে সেসব ওয়েবসাইট ছবিগুলোর সর্বসত্ত্ব সংরক্ষণ করে।

আমাদের সাথে যুক্ত হও!

Websites:

Main: https://www.shikkhaweb.com

English Club: https://englishclub.shikkhaweb.com

Science Club: https://scienceclub.shikkhaweb.com

Blog: https://blog.shikkhaweb.com

Ask: https://ask.shikkhaweb.com

Bigganangon: https://bigganangon.shikkhaweb.com

Press: https://press.shikkhaweb.com

Facebook Pages:

Main: https://www.facebook.com/ShikkhaWeb

Team: https://www.facebook.com/ShikkhaWebTeam

English Club: https://www.facebook.com/ShikkhaWebEC

Science Club: https://www.facebook.com/ShikkhaWebSC

Bigganangon: https://www.facebook.com/SWBigganangon

Facebook Groups:

Main: https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWeb

English Club: https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWebEC

Science Club: https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWebSC

LinkedIn:

Main: https://www.linkedin.com/company/ShikkhaWeb

English Club: https://www.linkedin.com/company/ShikkhaWebEC

Science Club: https://www.linkedin.com/company/ShikkhaWebSC

Bigganangon: https://www.linkedin.com/company/Bigganangon

Others:

Twitter: https://www.twitter.com/@ShikkhaWeb

Instagram: https://www.instagram.com/ShikkhaWeb

পূর্বের ম্যাগাজিন চারটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে
এখানে ক্লিক করুন

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

ইঞ্জিন

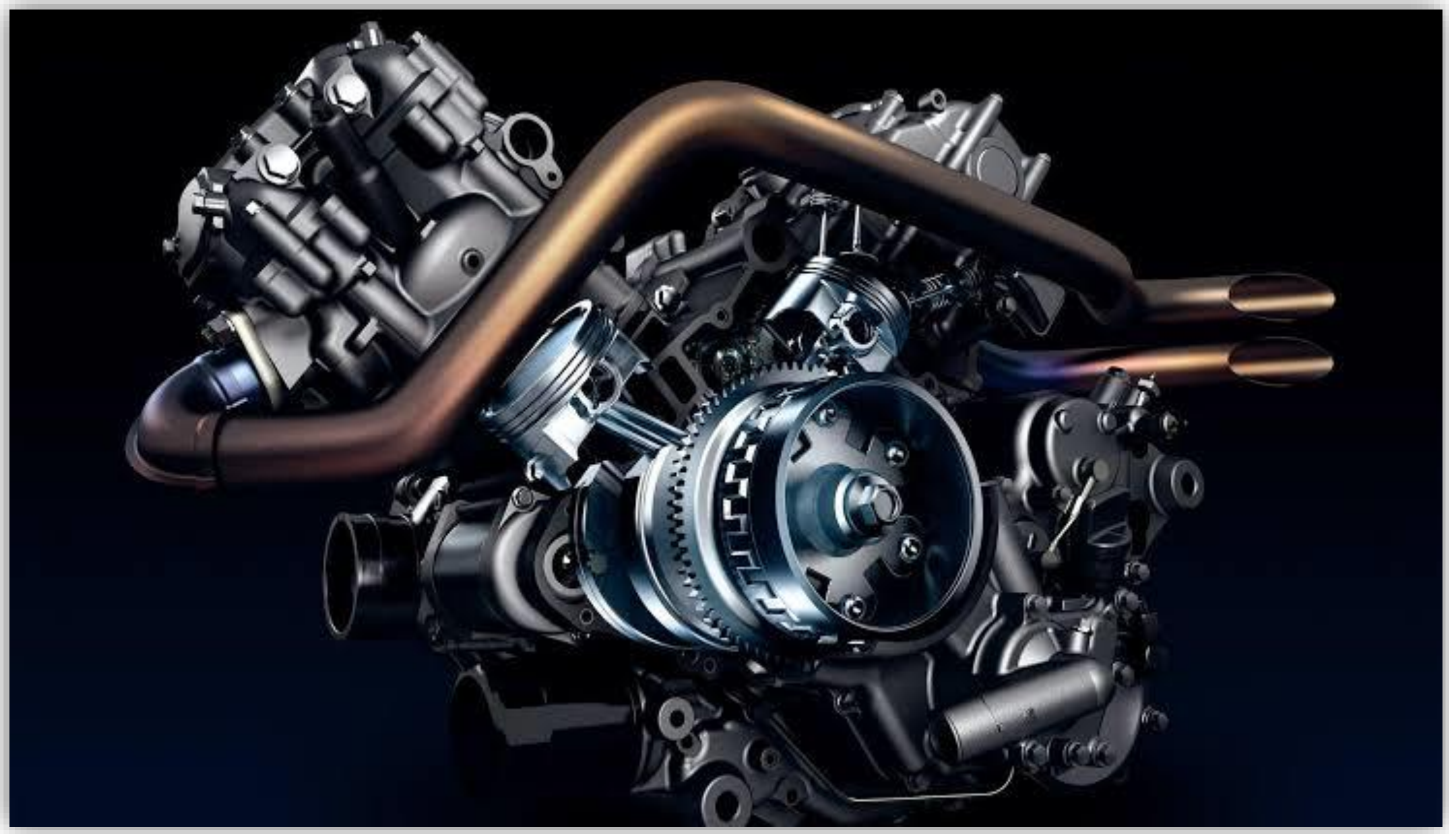

সাজিদ হোসাইন আদিব

"শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, এটি কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রুপান্তরিত হয়। " এই বিখ্যাত লাইন টি আমরা স্কুল কলেজে পড়ি নি এরকম খুব কম মানুষ ই পাওয়া যাবে। এখন কথা হলো বুঝলাম যে শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই কিন্তু এটা রুপান্তর হয়। এখন কথা হলো এই রুপান্তর টা কে করে? তাকে কি বলে? রূপান্তর কোন শক্তি থেকে কোন শক্তি তে হয়? এই সব গুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে একটি শব্দেই। সেটি হলো 'ইঞ্জিন'।

একদম সহজ বাংলায় যা এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে তাকেই ইঞ্জিন বলা হয়। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আমরা আজকাল অনেক ধরনের ইঞ্জিন দেখতে পাই। য্বমন কিছু ইঞ্জিন আছে যেগুলো গাড়িতে ব্যবহার করা হয়, কিছু ধরনের ইঞ্জিন গাড়ি তৈরিতে ব্যবহার হয়। তবে যে ইঞ্জিন ই হোক না কেন সাধারনত সব ইঞ্জিনের কাজ করার ধরন একই। সেটা হলো তাপশক্তীকে মেকানিকাল শক্তি বা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। যদিও অনেক ধরনের ইঞ্জিন আছে যেগুলো তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিকে রূপান্তর করে না। অন্য শক্তিকে যেমন টেসলা কার বিদ্যুৎ শক্তিতে চলে। ধারাবাহিক ভাবে সেগুলো নিয়েও আলোচনা হবে। আজকে আমাদের ইঞ্জিন নিয়ে প্রথম পর্ব।

আমরা আগেই জেনেছি যে সাধারণত বেশিরভাগ ইঞ্জিন তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে; এখন প্রথমত জানা প্রয়োজন যে যান্ত্রিক শক্তি কি? আর তাপ শক্তি কি?

তাপ দিয়ে আমরা যদি কোন কাজ করতে পারি সেটাই তাপ শক্তি।আর যান্ত্রিক শক্তি হলো স্থিতি শক্তি আর গতি শক্তির সমষ্টি । যান্ত্রিক শক্তি মানে খুব সাধারণ ভাবে যন্ত্রের শক্তি কে বোঝাই যথেষ্ট। এখন এই তাপ শক্তি আমরা বিভিন্ন ভাবে পেতে পারি। যেমন: সরাসরি পানি বয়েল করে তাপ শক্তি, ফুয়েল বা জ্বালানী পুড়িয়ে তাপশক্তি।

এখন কথা হচ্ছে তাহলে তো ভাইয়া যে পরিমাণ শক্তি ফুয়েলে থাকবে সে পরিমাণ আউটপুট পাব তাই না?

এখন একটা জিনিস দেখা লাগবে যে সাধারণত আমরা তাত্ত্বিকভাবে এটা ব্যাখা করে দেখি যে যে পরিমাণ এনার্জি ইনপুট হবার কথা সে পরিমাণ এনার্জি আউটপুট পাবার কথা। এধরণের ইঞ্জিনকে বলা হয়া কার্নো ইঞ্জিন। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কোন ইঞ্জিনের আসলে অস্তিত্ব নেই। তার মানে যে পরিমাণ শক্তি আমি তাপশক্তি হিসেবে ইঞ্জিনে দিব সে পরিমাণ শক্তি আমি ইঞ্জিন থেকে আউটপুট পাব না। এখানে সিস্টেমে লস হয়৷ ইঞ্জিনে শক্তি কনভার্ট করতে এনার্জি লস হয়ে যায়। এজন্য কোনো ইঞ্জিনের ই কর্মদক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি ১০০% হয় না। কেবল মাত্র আধম্যাতিক কার্নো ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি ই ১০০ ভাগ হয়।

তাহলে সাধারণত আমরা হিট ইঞ্জিন বা তাপ ইঞ্জিন হলো সে ধরনের যা জ্বালানির রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তি কে রূপান্তর করে এবং সেই তাপশক্তি থেকে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে৷

এখন এই জ্বালানী পুড়িয়ে তাপ শক্তি উৎপন্ন করার প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তাপ ইঞ্জিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

(১) Internal Combustion Engines (IC Engines)
(২) External Combustion Engines (EC Engines)

এই IC ইঞ্জিন এর নাম আমরা কমবেশি অনেকেই শুনেছি। না শুনলেও সামনে শুনব; এখন IC ইঞ্জিন কি?

IC ইঞ্জিনের নাম থেকেই অনেকটা ধারণা করা যায় এর কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে। যেমন Internal Combustion মানে হলো অভ্যন্তরীণ দহন। তার মানে হচ্ছে যে ইঞ্জিনে জ্বালানি ইঞ্জিনের অভ্যন্তরেই পুড়বে মানে আমরা জ্বালানির দহন খালি চোখে দেখব না সেটা হলো IC ইঞ্জিন।

তাহলে খুব সহজভাবেই External Combustion (EC) ইঞ্জিন ব্যাখ্যা করা যায়। ইতিমধ্যে অনেকে ধারণা করেও ফেলেছেন। যে ইঞ্জিনে জ্বালানি ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে পুড়বে না মানে যেখানে জ্বালানি দহন টা সিলিন্ডার এর বাইরে ঘটবে। এসব ইঞ্জিন সাধারণত এখন আর অতটা ব্যবহার করা হয় না। সামনে উদাহরণ এর সাহায্যে আমরা আরো স্পষ্ট ধারনা পাব।

সূত্র: FUNDAMENTALS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES by H. N. Gupta

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

ভিপিএন কি, কিভাবে কাজ করে এবং কেন ব্যবহার করব?

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

এই মার্চ মাসে ভিপিএন-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি এমন বাংলাদেশি খুব কমই আছে। যারা তারপর অনুভব করেন নি, আপনাদের জন্য সমবেদনা ছাড়া কিছুই নেই। এখন যদি জিজ্ঞাসা করেন মার্চ মাসে কি জন্য ভিপিএন দরকার ছিল তাহলে আমি উত্তর দিতে পারব না। কেন দিতে পারব না, সেটাও বলতে পারব না। যাইহোক, শুরু করা যাক (এবার সিরিয়াস)।

ভিপিএন কি?

প্রথমেই প্রশ্ন আসে ভিপিএন (VPN) মানেটা কি? খায় না মাথায় দেয়? আসলে খায়ও না, আবার মাথায়ও দেয় না। ভিপিএন হল ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Virtual Private Network)। নাম থেকেও আন্দাজ করা যায় যে, ভিপিএন কোন ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক না, ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক। তাই এই কানেকশন নিতে আপনার বাসায় ইয়া বড় বড় যন্ত্রপাতি বসাতে হবে না। ভার্চুয়ালি সব হবে।

নামের মধ্যে প্রাইভেট শব্দটাও আছে। বোঝাই যাচ্ছে, এটা পাবলিক নয়, পার্সোনাল নেটওয়ার্ক। ফলে সিকিউরিটি বেশ ভালোই হবে। এই গেল কি এর উত্তর।

ভিপিএন কেন?

এবার কিভাবে কাজ করে সেটা জানা যাক। ধরুন বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধ চলছে। সময়টা ১৯৭১। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আমি জানি এখন কি বলবেন। আচ্ছা ধরে নেন, ১৯৭১ সালে বর্তমানের মত উন্নত ইন্টারনেট সার্ভিস ছিল। ধরলাম এখানে উমর ফারুক নামে একজন বীর যোদ্ধা অন্য এক যোদ্ধার সাথে ফেসবুকে মেসেজের মাধ্যমে অন্য যোদ্ধাকে যুদ্ধের পরিস্থিতি জানাবে। কিন্তু দেশের নেটওয়াকিং সিস্টেম তো পুরোপুরি পাকিস্তান সরকারের হাতে। তারা চালাকি করে এই রিজিয়নের (রিজিয়ন মানে হল এলাকা/দেশ) জন্য ফেসবুককে ব্লক করে দিল। এখন উমর ফারুক পড়লেন বিপাকে। ফেসবুকে ঢুকতে পারছেন না। তারপর তিনি হতাশ হয়ে বিটিভি দেখতে বসলেন। বিটিভিতে হটাৎ তার জন্য আশার বানি নিয়ে আসলো এক বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি ছিল বল্টু ভিপিএনের। এই ভিপিএন ব্যবহার করলে ব্লক হওয়া ফেসবুক ব্যবহার করা যাবে বলে জানা গেল। উমর ফারুককে আর পায় কে! দ্রুত ভিপিএন ডাউনলোড করে পাকিস্তান সরকারের চোখ এড়িয়ে,

ফেসবুকে ঢুকে অপর যোদ্ধার সাথে অসমাপ্ত ডেটা শেয়ারিং সেরে নিলেন। এখন প্রশ্ন কিভাবে এতকিছু হল? ভিপিএন অনেকটা টানেল বা সুড়ঙ্গের মত কাজ করে। ভিপিএনে যখন কানেক্ট করবেন, তখন তারা আপনাকে একটা সার্ভারে কানেক্ট করিয়ে দিবে। কিন্তু তাতে কি লাভ? যারা একটু কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে আইডিয়া রাখেন তারা খানিকটা আঁচ করে ফেলেছেন নিশ্চয়ই? জ্বী হ্যাঁ, প্রতিটা সার্ভারের আইপি এড্রেস (IP Address) থাকে। তারা আপনার আইপির বদলে তাদের সার্ভার আইপি ব্যবহার করতে দিচ্ছে। তাতে লাভ আরেকটা হচ্ছে। আপনি তাদের সার্ভারের মাধ্যমে যেকোনো ওয়েবসাইটে কানেক্টেড হচ্ছেন। ফলে আপনার আইএসপি (ISP) বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (Internet Service Provider) জানতেই পারছে না যে আপনি ফেসবুকে ঢুকছেন। কেননা ফেসবুকের কাছে আপনার আইএসপি থেকে সরাসরি কানেকশন যাচ্ছে না, বরং সেই ভিপিএন সার্ভারের মাধ্যমে যাচ্ছে। তাই একে তো আপনার আইপি এড্রেস পাচ্ছে না, অন্যদিকে আপনার কোন ট্রেস থাকছে না। মানে আপনি ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ভিপিএন-এর সুবিধা কি?

আচ্ছা সবই নাহয় বুঝলাম। কিন্তু কি কি কাজে এটা ব্যবহার করতে পারব বা সুবিধাদি কি কি?

১. আইপি এড্রেস হাইড করে গোপনে ব্রাউজ করতে পারবেন। কোথাও আপনার ফুটপ্রিন্ট থাকবে না (এই ফুটপ্রিন্ট, সেই ফুটপ্রিন্ট না)।

২. আপনার ব্রাউজিং হিস্টোরি বা ট্রেস থাকবে না আইএসপির কাছে। এমনকি পাবলিক নেটওয়ার্কগুলোও নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে।

৩. ব্লক হওয়া ওয়েবসাইটগুলো সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন।

৪. অনলাইনে নিজের নিরাপত্তা থাকছে। লোকেশন ডেটা কেউ দেখতে পারছে না।

৫. যেকোনো ডেটা নিরাপদে আদান-প্রদান করতে পারছেন। ফলে কিছু ফাঁস বা লিক হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছেন।

৬. এক দেশে অবস্থান করে অন্য দেশের আইপি এড্রেস ব্যবহার করে সেই দেশের কোন অতিরিক্ত সুবিধা ব্যবহার করতে পারছেন।

সূত্র: https://nr.tn/3sAmx8J

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

নেবুলা

নাবাইল আহমেদ নির্ঝর

জ্যাতির্বিজ্ঞানীদের মতে নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে মহাকাশে ভাসমান বিশাল গ্যাস পিণ্ড থেকে। এই গ্যাস পিণ্ডগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা বা নেবুলা। নেবুলা বা নীহারিকা হচ্ছে মূলত মহাকাশে অবস্থিত গ্যাস এবং ধূলিকণা দ্বারা তৈরি বিশাল আকারের মেঘকে বোঝায়। রাতে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকালে আবছা আলোর

কিছু ছোপ দেখা যায় যা মূলত নেবুলা। কিছু নেবুলা তৈরি হয়েছে মৃত তাঁরা যাকে আমরা সুপারনোভা বলে থাকি এর বিস্ফোরণ থেকে প্রাপ্ত গ্যাস এবং ধূলিকণা থেকে। বাকি নেবুলাদের মধ্যে বেশিরভাগ মূলত গ্যাস ও ধূলিকণা একত্রিত হয়ে নতুন তাঁরা তৈরির সূচনা ঘটায় যাকে "স্টার নার্সারিস" বলা হয়ে থাকে। আমরা জানি নেবুলা গ্যাস ও ধূলিকণার তৈরি যার মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। নেবুলার এই গ্যাস ও ধূলিকণা মহাকাশের খুব বিস্তৃত জায়গা নিয়ে ছরিয়ে থাকে। এই গ্যাস ও ধূলিকণা মার্ধ্যাকর্ষন বলের প্রভাবে একত্রিত হতে থাকে এবং এরা যত ঘন হয় ততই এদের মার্ধ্যাকর্ষন বল বৃদ্ধি পায়। একসময় এদের মধ্যকার মার্ধ্যাকর্ষন বল এতই বৃদ্ধি পায় যে এদের মদ্ধ্যকার কোনাগুলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে নেবুলার কেন্দ্রে তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটি তাঁরা তৈরির সূচনা ঘটে।

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী নেবুলা হচ্ছে হেলিক্স নেবুলা যা একটি মৃত-তাঁরার অবশেষ দ্বারা তৈরি এবং এর পৃথিবী থেকে ৭০০ আলোকবর্ষ দূরে এর অবস্থান।

বাহ্যিক অবস্থার দিক থেকে নেবুলাকে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। আকাশে কখনো কখনো অনির্দিষ্ট আকারের কালো কালো ছোপ কিংবা কোনো উজ্জ্বল তাঁরার আলোকে বাঁধা দেওয়ার সময় অনুজ্জ্বল নেবুলাকে লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে উজ্জ্বল নেবুলা আকাশে হালকা দীপ্তিমান অবস্থায় থাকে। এরা কখনো নিজেরাই আলো নির্গমন করে আবার নিকটবর্তী তাঁরার আলোর প্রতিফলন ঘটায়।

অনুজ্জ্বল নেবুলাতে সাধারণত গ্যাস ও ধূলিকণার ঘনত্ব বেশি থাকে কিন্তু তাপমাত্রা তুলনা মূলক কম হয়। অন্যদিকে উজ্জ্বল নেবুলাকে কিছু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমনঃ রিফ্লেক্সান নেবুলা, H II নেবুলা, ডিফিউজড আয়োনাইজড গ্যাস, প্ল্যানেটারি নেবুলা এবং সুপারনোভার অবশিষ্টাংশ।

যে সকল নেবুলা তার নিকটবর্তী তাঁরা থেকে নির্গত আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে উজ্জ্বল দেখায় তাদেরকে রিফ্লেকশান নেবুলা বলা হয়। এরা নিজেরা আলোর বিকিরণ ঘটাতে অক্ষম।

H II নেবুলা হল আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাসের মেঘ। মূলত নিকটবর্তী বৃহৎ এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত তাঁরা থেকে নির্গত তাপের ফলে নেবুলার হাইড্রোজেন আয়নিত হয়ে যায়। ধনাত্মক আয়নিত হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার থেকে নির্গত বিকিরণ

থেকে ডিফিউজড আয়োনাইজড গ্যাস নেবুলা নির্ধারিত করা যায়। এদের বিকিরণ অন্যান্য নেবুলা থেকে বেশি হয়ে থাকে।

প্ল্যানেটারি নেবুলা সুপারনোভা থেকে কম ভর বিশিষ্ট মৃত তাঁরার ধ্বংসাবশেষ থেকে তৈরি। এরা দেখতে অনেক উজ্জ্বল এবং গোলাকার অনেকটা গ্রহের মত তাই একে প্ল্যানেটারি নেবুলা বলে। অবশেষ সুপারনোভার অবশিষ্টাংশ থেকেও নেবুলা তৈরি হয়। মহাকাশে বৃহৎ তাঁরার বিস্ফোরণকে সুপারনোভা বলে। সুপারনোভার অবশেষ থেকে অনেক সময় নেবুলার উৎপত্তি ঘটে।

আমরা জানি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তি নেবুলাও প্রায় ৭০০ আলোকবর্ষ দূরে অর্থাৎ যদি কোনো বস্তুকে আলোর গতিতে পাঠানো হয় তাহলে বস্তুটি পৌছতে প্রায় ৭০০ বছর সময় লাগবে। তাই নেবুলার ছবি তোলার জন্য মহাকাশ গবেষকরা অনেক শক্তিশালী টেলিস্কোপের ব্যবহার করে থাকে যেমন নাসা স্পিটজার স্পেস টেলিস্কোপ এবং হাবল স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এখন পর্যন্ত অনেক দূরবর্তী নেবুলার ছবি নিতে পেরেছেন।

সূত্র: https://bit.ly/3m4bXo4, https://go.nasa.gov/3dkwyAp

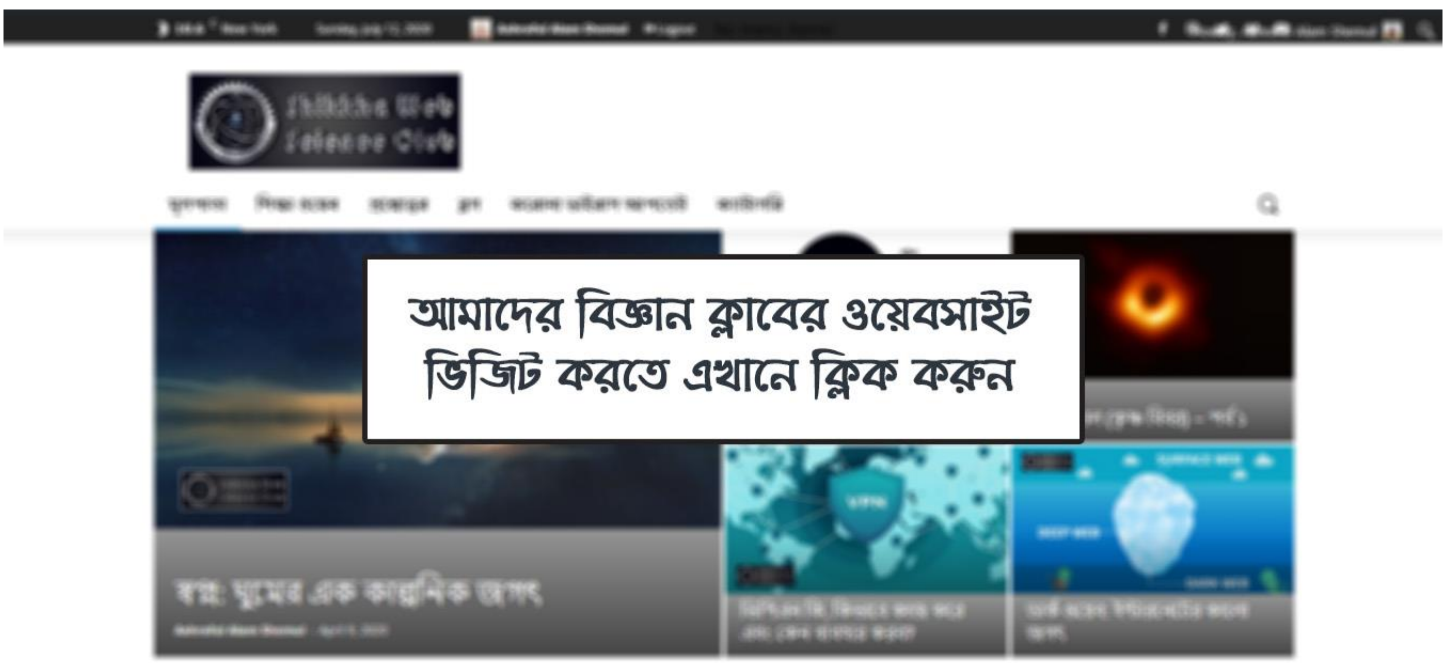

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাবের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে এখানে বা উপরের ছবিতে ক্লিক করুন

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

আলোকবর্ষ

মাহফুজ রহমান

মা বাবা খুব ভেবেচিন্তে নাম ঠিক করেছিলেন আলোকবর্ষ। যেমন নাম তেমন কাজ। চোখ ফোটার পর থেকেই ছেলে শুধু আকাশের তারার দিকে অবাকদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কিশোর বয়সে মহাকাশ বিজ্ঞান তার একমাত্র নেশা। যে সময় পাড়ার সমবয়সী ছেলেরা ক্রিকেট আর ফুটবলের নেশায় মত্ত তখন আলোকবর্ষ শুধু অজানা তারার সন্ধানে ব্যস্ত। কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে অজানা নক্ষত্রের খোঁজে। বাস্তব পৃথিবীর বন্ধুরা তার কাছে তুচ্ছ, এই পৃথিবীর সমস্ত জিনিস তুচ্ছ, ফুলের শোভা তুচ্ছ, পাখির কলরব তুচ্ছ, এমনকি মানুষের ভালোবাসাও তুচ্ছ। সে এমন এক বন্ধু খুঁজতে চাইছে যে হবে ঠিক তারই মত দেখতে একটা প্রাণী, আর সবদিক থেকে অবিকল তার সমতুল্য। সে জানতো ডারউইনের ভাষায় যেটা অসম্ভব, অন্তত এই পৃথিবীতে অসম্ভব।

আর টাইম ট্রাভেল নিয়ে তো গবেষণা চলছে তাই আপাতত এটা তো সম্ভব না কোনোভাবেই দেখা করুক। তাই সে যোগাযোগ করতে চাইছে প্যারালাল ইউনিভার্সের সাথে যেখানে সে আরেকটা পৃথিবী খুঁজে পাবে, আর পাবে তারই মত অবিকল একজনকে। একদিন সন্ধ্যায় চিলেকোঠার ছাদে বসে সে যোগাযোগ করে ফেলল এমনি এক বন্ধুর সাথে যে বহু আলোকবর্ষ দূরের অন্য এক পৃথিবীর। সে তো অবাক!! এটা কি আদৌ সম্ভব? নাকি শুধুই আমার কল্পনা? সারাদিন Predestination, Interstellar, Doctor Who, Dark, Stranger Things দেখে কি আমি কল্পকাহিনিকে বাস্তব ভাবা শুরু করেছি? সেই ছেলেটিও অবিকল আরেক আলোকবর্ষ। তার নাম, ঠিকানা, বয়স, ভাষা সবই এক। কিন্তু সেই পৃথিবীর সময় উল্টো দিকে চলে। তাই সেই ছেলেটি যৌবন থেকে কৈশোরে পা রেখেছে ঠিক যেমন আমাদের আলোকবর্ষ শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পেয়েছে। কিন্তু তারা দুজনেই এখন কৈশোরের সমান পর্যায়ে। এই ওভারল্যাপের কারণেই তারা নিজেদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। তবে তাদের এই ওভারল্যাপ শুধু দুই মিনিটের। তাদের কথাবার্তা শুরু হতেই আলোকবর্ষ বুঝতে পারল যে নাম, ঠিকানা আর শারীরিক গঠন এক হলেও সেই ভিন্ন পৃথিবীর ছেলেটির স্বভাব একদম ভিন্ন। সে নিজে শান্ত, স্বল্পভাষী আর যুক্তিবাদী হলেও অন্য জন ঠিক উল্টো, অনেকটা আবেগপ্রবণ। হয়ত সে উল্টো পথের যাত্রী, তাই এই রকম।

প্রথম এক মিনিট তাদের পরিচয় বিনিময়েই কেটে গেছে। এর পর তাদের স্বল্প সময়ের র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ড শুরু হল।

উল্টো আলোকবর্ষ: আমার কিছু জানার নেই। তোমার কিছু থাকলে বল।

আলোকবর্ষ: আচ্ছা, তোমার কি লেখাপড়া করতে হয়? আমাদের মতো তোমাদেরও কি বইয়ের মাঝে মুখ থুবড়ে পরে থাকতে হয়?

উল্টো আলোকবর্ষ: আমাদের পড়তে হয়,জানতে হয় তবে তোমাদের মতো না আমাদের পদ্ধতি উল্টো। আমরা পড়ি জানার জন্য।

আলোকবর্ষ: আচ্ছা, তোমার বাবা-মা কি আমার বাবা-মায়ের মতো?

উল্টো আলোকবর্ষ: হ্যাঁ, অবিকল তোমার বাবা-মায়ের মতো!

আলোকবর্ষ: অবিকল! তাহলে তারাও কি আমরা মতো তোমাকে শুধু জিপিএ-৫ এর যাতাকলে পিষ্ট করে ফেলেন?

উল্টো আলোকবর্ষ: আরে নাহ্,বললাম না সব উল্টো এখানে।

আলোকবর্ষ: তুমি যখন উল্টো পথে চলছ তাই তোমার অভিজ্ঞতা আর অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে যদি কিছু বল।

উল্টো আলোকবর্ষ: ও, এই ব্যাপার! তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জানতে চাইছে। তাহলে অ্যাস্ট্রোনমি না পড়ে অ্যাস্ট্রোলজি পড়তে পারতে। যাইহোক, আমি জীবনে অনেক দেখেছি, অসাধারণ সব আবিষ্কার করেছি। টাইম মেশিনে অনেক গ্রহ ঘুরে এসেছি যেখানে প্রানের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু জানো তো, এই পৃথিবীর মত সুন্দর কিছু খুঁজে পাইনি। এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। শুধু এখানেই একটা প্রাণী আরেকটা প্রাণীকে

ভালোবাসে। এই পৃথিবীর মত শান্তি কোথাও নেই। আমি ভাবছি অনেক তো দূরের জিনিস দেখলাম, এবার শুধু কাছের জিনিস নিয়েই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। অনেক বন্ধু বানাতে চাই। অনেক গল্প করত চাই। নিজের আশপাশের পরিবেশটা ভালো করে দেখতে চাই।" এই বলে দীর্ঘ নিঃস্বাস ফেলে কিছুক্ষন চুপ করে রইল। পেছনে একটা গান শোনা যাচ্ছিল।

"শুধু শুধু ছুটে চলা, একই একই কথা বলা, নিজের জন্য বাঁচা নিজেকে নিয়ে।

যদি ভালোবাসা নাই থাকে, শুধু একা একা লাগে,

কোথায় শান্তি পাব কোথায় গিয়ে।"

আলোকবর্ষ পরের প্রশ্ন করার আগেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পরের দিন বিকেলে আলোকবর্ষকে জীবনে প্রথমবার খেলার মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

টেক টক

প্রযুক্তি বিষয়ক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান শাওমি তাদের নতুন লোগো উন্মোচন করেছে! গত মঙ্গলবার (মার্চ ৩০, ২০২১) তারিখে তারা এই নতুন লোগো উন্মোচন করে।

নতুন এই লোগোটি তারা তৈরি করেন বিশ্ববিখ্যাত ডিজাইনারকে দিয়ে। তিনি হলেন, মুসাশিনো কলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং নিপ্পন ডিজাইন সেন্টারের সভাপতি কেনিয়া হারা। শাওমি জানায় তাদের এই নতুন লোগো গণিতের সমীকরণ দিয়ে বর্ণনাযোগ্য। সাথে এও জানায় যে, এই লোগো তৈরির প্রক্রিয়া সেই ২০১৭ থেকে চলমান ছিল।

সূত্র: https://bit.ly/2Pen5Tv

বই রিভিউ: মহাকর্ষ তরঙ্গ

লেখক: আবদুল গাফফার রনি

প্রকাশক: অন্বেষা

রিভিউকারী: মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

জ্যোতির্বিজ্ঞান যাদের পছন্দ, তাদের পছন্দের তালিকায় থাকবে **'মহাকর্ষ তরঙ্গ'** নামের বইটি। নিউটনীয় সূত্র আমাদের পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের কিছু অংশের সবকিছু বর্ণনা করতে পারলেও পুরো মহাবিশ্বের সব বর্ণনা করতে গেলে, এ সূত্র মুখ থুবড়ে পড়বে বললে ভুল হবে না। তখন প্রয়োজন পড়বে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার দু'টো তত্ত্ব। এই আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ধারাবাহিকতায়ই চলে আসে **মহাকর্ষ তরঙ্গ**। এটির প্রস্তাবনা দেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। আবার স্বয়ং আইনস্টাইনই এই তরঙ্গকে নাকচ করে দেন! তারপরও শেষমেশ বিশ্ববাসী সাক্ষী হল সেই মহাকর্ষ তরঙ্গের! কিভাবে কি হল, বিস্তারিত জানতে হলে পড়তে হবে পুরো বইটিই।

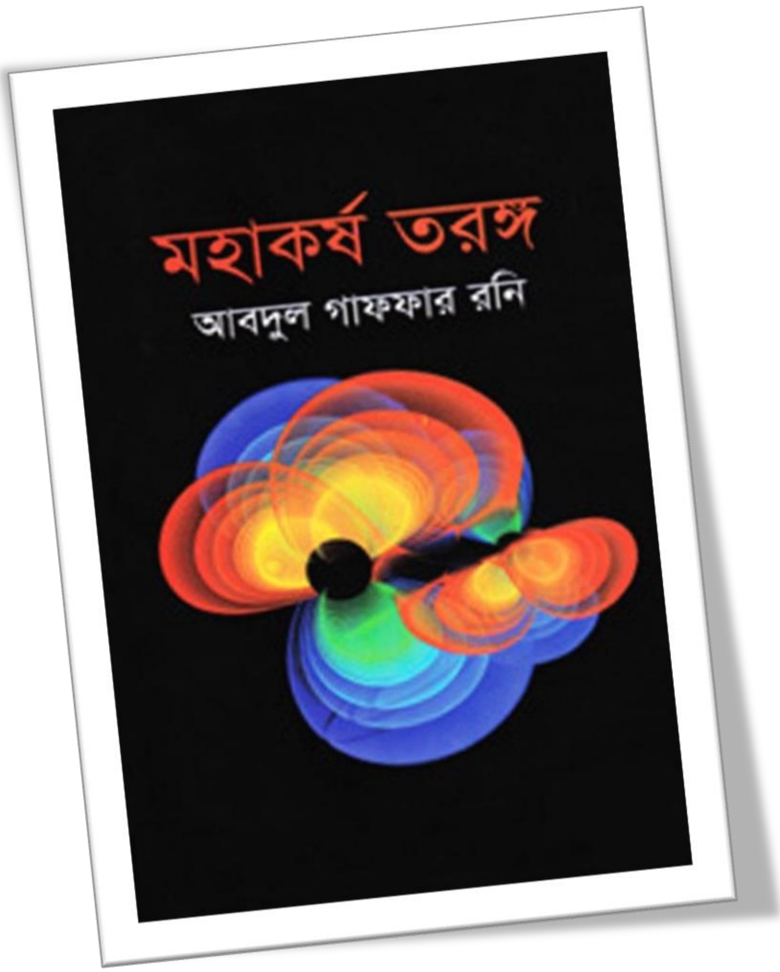

বইটির একটা বিষয় সবচেয়ে ভালো লেগেছে। সেটি হল, বইয়ে একদম শূন্য থেকে সব আলোচনা ছিল। ফলে পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব ভালো জ্ঞান না থাকলেও বোঝা যাবে বইয়ের সবকিছুই।

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

কালপুরুষ

নাবাইল আহমেদ নির্ঝর

আমাদের রাতের আকাশে পরিচিত তারামণ্ডলের মধ্যে কালপুরুষ বা অরিয়ন তারামণ্ডল একটি। এই তারামণ্ডলটি পৃথিবীর প্রায় সব স্থানের রাতের আকাশে দেখা যায়। কালপুরুষ উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল অনেকগুলো তাঁরা নিয়ে গঠিত যার মধ্যে প্রধান তাঁরা ১০টি। এটি আকাশের +৮৫° থেকে -৭৫° অক্ষাংশের মধ্যে দৃশ্যমান। মূলত বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান করার কারনেই পৃথিবীর প্রায় সব স্থান থেকে এই তারামণ্ডলটি দেখা যায়।

কালপুরুষ বা অরিয়ন তারামণ্ডলের মধ্যে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী তাঁরার হল কার্তিকেয় (Bellatrix) যার দূরত্ব ২৪৫ আলোকবর্ষ এবং সবচেয়ে দূরবর্তী হল অনিরুদ্ধ (Alnilam) যার দূরত্ব ১৩৪২ আলোকবর্ষ। এই তারামণ্ডলটির গঠনকে মাথা(Head), কোমর(Belt), তরবারি(Sword), মুগুর(Club) ও ঢাল(Shield) এই ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

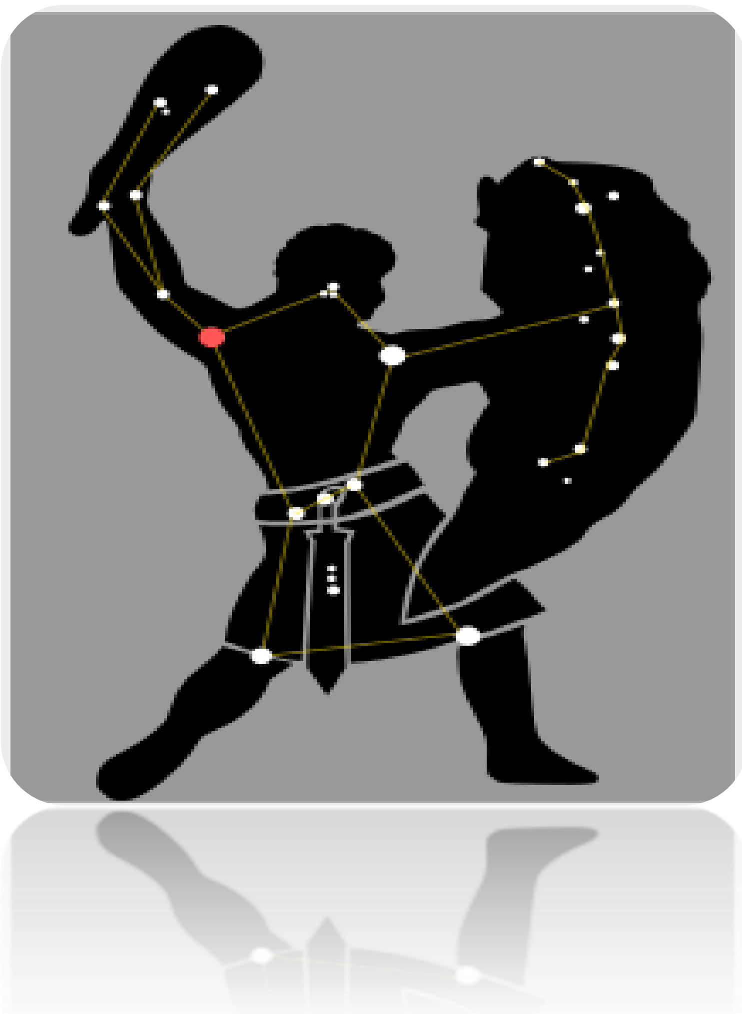

কালপুরুষের কোমর (Belt) তিনটি তাঁরার নিয়ে গঠিত যা হল চিত্রলেখ (Mintaka), অনিরুদ্ধ (Alnilam) ও ঊষা (Alnitak)। এখানে সর্ব উত্তরে চিত্রলেখ, সর্ব দক্ষিনে ঊষা ও মাঝখানে অনিরুদ্ধ অবস্থান করে। কালপুরুষের মাথা একটি উজ্জ্বল ও দুইটি তুলনামূলক কম উজ্জ্বল তাঁরার সমন্বয় গঠিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তাঁরা হচ্ছে মেইসা (Meissa) এবং এর নিচে দুইটি ফি- অরিয়ন (ϕ- Orion) তাঁরা মিলে একটি ত্রিভুজ আঁকার গঠন করে যাকে বাংলায় মৃগশিরা বলে। কোমরের নিচে অনেকগুলো ছোট ছোট তাঁরা মিলে তরবারি গঠন করে যার মধ্যে আইওটা অরিওনিস একটি। যেই হাতটিতে মুগুর থাকে সেই হাতটি শুরু হয় আদ্রা (Betelgeuse) নামক একটি উজ্জ্বল তাঁরা থেকে। অপরদিকে যে বাহুতে ঢাল থাকে সেই বাহুটি তৈরি হয় কার্তিকেয় (Bellatrix) নামক তাঁরা থেকে এবং ৬টি পাই-অরিয়ন(π-Orions) তাঁরা নিয়ে ঢাল গঠন করে।

অরিয়ন তারামণ্ডলের নাম অরিয়ন এসেছিলো গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর শিকারি থেকে যার নাম ছিল অরিয়ন। তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এর নাম ভিন্ন। প্রাচীন মিসরে এই তারামণ্ডলকে প্রাচীন মিসরীয় দেবতা ছাহ(Sah) মনে করা হত। আরবের মধ্যযুগে আল-জাবর অনুশারে একে দানব(The Giant) বলা হত। ভিন্ন সভ্যতায় শিকারির হাতে ঢালের জাগায় সিংহ মনে করা হয়।

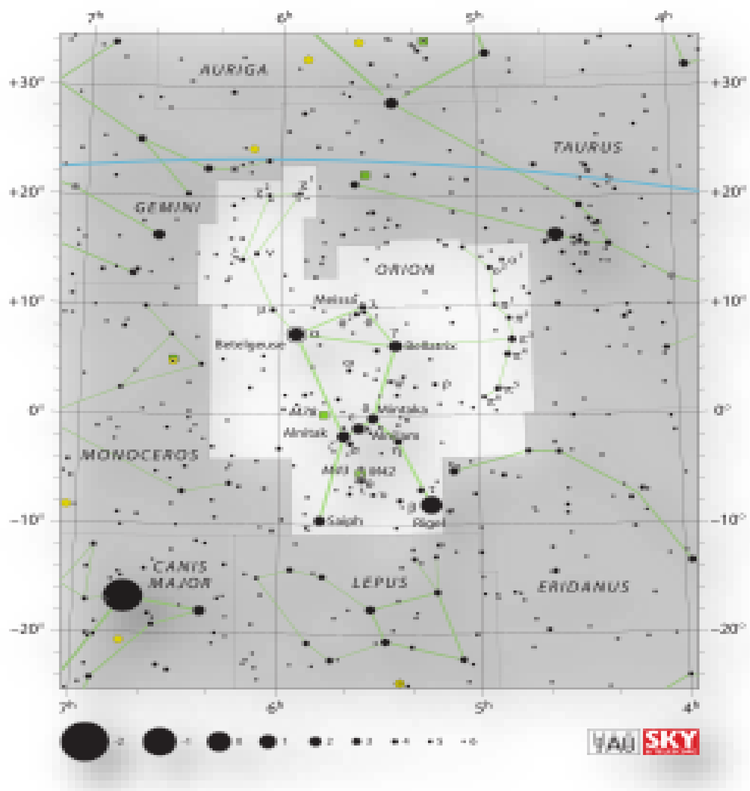

সূত্র: https://bit.ly/3m6Cm4H

আইওটি নিয়ে অনুসন্ধান

উম্মে সালমা

আপনি যে বইটি পড়ছেন তা কীভাবে পড়ছেন? হয়ত সেটা ডেস্কটপ, মোবাইল, বা ট্যাবলেট কিন্তু যেটাই ব্যবহার করেন না কেন, সেটা মূলত ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত আছে । ইন্টারনেট সংযোগ একটি বিস্ময়কর জিনিস, এটি আমাদের ওই সকল সুবিধা দেয় যা আগে কখনো সম্ভব ছিল না। মূল কথা হলো ইন্টারনেট সংযোগ আমাদের কিছু অপূর্ব সুবিধা দেয়। এই সুবিধা গুলো আমাদের স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ এবং ট্যাবলেট বা অন্য যা কিছু আছে তার জন্য দেখেছি। সব কিছুর জন্যই এগুলো সত্যি এবং সব কিছু বলতে আমরা সব বোঝাচ্ছি। আর এখানেই আইওটি শব্দটি আসে।

আইওটি কী?

ইন্টারনেট অফ থিংগস পারস্পারিক সম্পর্ক যুক্ত একটি ব্যবস্থা যেখানে কম্পিউটিং ডিভাইস, মেকানিক্যাল এবং ডিজিটাল মেশিন, জিনিস, প্রাণী বা মানুষ কে একটি আলাদা ও একক পরিচিতি দেয়া হয় এবং ডাটা আদান প্রদান করা হয় নেটওয়ার্ক এর সাহায্যে, যেখানে মানুষ থেকে মানুষের বা মানুষ থেকে কম্পিউটারের কোনও ছোঁয়ার দরকার নেই।

আইওটির ইতিহাস

ইন্টারনেট অফ থিংগস শব্দটির বয়স ১৬ বছর । কিন্তু সংযুক্ত ডিভাইস কথাটি আরও আগে থেকে প্রচলিত, অন্তত ৭০ দশক থেকে । আগে প্রায়ই ধারণাটিকে বলা হতো "আবদ্ধ ইন্টারনেট" অথবা "পরিব্যাপক কম্পিউটিং" । সত্যিকার অর্থে কেভিন এসটন 'ইন্টারনেট অফ থিংগস' কথাটি প্রথম তাঁর কাজ প্রকটর এন্ড গেম্বলে ব্যবহার করেন।

এসটন যিনি একটি সাপ্লাই চেইন এ কাজ করতেন, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বরিষ্ঠদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে, একটি নতুন প্রযুক্তি নিয়ে যেটির নাম ছিল আর এফ আই ডি। কারণ ১৯৯৯ সালে ইন্টারনেট ছিল সবচেয়ে নতুন প্রবণতা এবং সেটি যুক্তিগত ছিল । সে তাঁর প্রেসেনটেসনের নাম দিল 'ইন্টারনেট অফ থিংগস'।

আইওটির ব্যবহার

বিভিন্ন জায়গায় আইওটির বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যবহার দেখা যায়। কিছু ব্যবহার আছে বাসা-বাড়ি স্বয়ংচলনে, শরীর চর্চা খেয়াল রাখতে, স্বাস্থ্য দেখে রাখতে, পরিবেশ রক্ষার্থে, উন্নত নগরায়োনে এবং শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনায়।

বাসা স্বয়ংচলন

স্বয়ংক্রিত বাসা বাড়ি এখন বেশ জনপ্রিয় দুটি কারনে । প্রথমত সেন্সর এবং সঠিক প্রযুক্তি গুলো তারবিহীন সেন্সর নেটওয়ার্ক সহ অনেক খানি উন্নত হয়েছে। দ্বিতীয়ত মানুষ আজকাল প্রযুক্তিতে বিশ্বাস করে তাদের উন্নত জীবনের সমস্যা ও নিরাপত্তার আস্থা রাখে।

উন্নত যাতায়াত

উন্নত যাতায়াত ব্যবহার এখন দৈনন্দিন ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেন্সর এবং বুদ্ধি গত তথ্য প্রক্রিয়া করে।

আইওটি কেন?

যখন কোনো কিছু ইন্টারনেট এর সাথে যুক্ত থাকে, তার মানে এই যে সেটি যেকোনো তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে । আর এই আদান প্রদান ক্ষমতাটি জিনসটা কে স্মার্ট করে তোলে।

যেমন স্মার্ট ফোনের একটি উদাহরণ দেখি আমরা। এখন আপনি ফোনে যেকোনো গান শুনতে পারেন কিন্তু তার মানে এই না আপনার ফোনে বিশ্বের সব গান জমা করা আছে। বরং গানটি বিশ্বের এমন কোথাও জমা আছে যেখানে আপনি ফোন থেকে গানটির তথ্য চাইতে পারেন ও সেটি গ্রহণ করতে পারেন।

উন্নত পানি ব্যবস্থা

বিশ্বে পানির সংকট নিরাময়ে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে পানি উৎসের সঠিক ব্যবস্থাপনা করে। স্মার্ট ওয়াটার মিটারের সেন্সর আবহাওয়া সাটেলাইট ও নদীর পানির সেন্সরের তথ্য ব্যবহার করে এবং আগাম বন্যার পূর্বাভাস জানায়।

স্বাস্থ্য উপযুক্ততা

স্বাস্থ্যে এটির ব্যবহার বয়স্কদের স্বাধীন জীবন যাপনে সাহায্য করে। সেন্সর গুলি নিয়মিত স্বাস্থ্য অবস্থা খেয়াল করে যদি কখনো গুরত্বর কিছু হয়ে থাকে তখন তা জানান দেয় বা সাবধান করে।

উন্নত পরিবেশ ও কৃষি

পরিবেশের স্থিতিমাপ যেমন তাপমাত্রা এবং জলবায়ু কৃষির জন্য গুরত্ব পূর্ণ । সেন্সরের এই তথ্য ব্যবহার করে কৃষক তার কাজে অগ্রগতি আনতে পারবে।

শক্তি সংরক্ষণ

উন্নত গ্রিড একটি তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি যা আধুনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালন, বণ্টন এবং সংরক্ষন ব্যবস্থা সক্ষম করে।

সব শেষে বলতে পারি আইওটি আমাদের জীবন আগের থেকে সহজ করে দিয়েছে। আজ বা কাল এটির কাজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরবে।

ভাষান্তর: **তামরীন জাহান**

এখানে ক্লিক করে যোগ দিন শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাবের ফেসবুক গ্রুপে এবং বিজ্ঞান চর্চা করুন বাংলা ভাষায়!

পাই দিবস

নিয়াজ আহমেদ

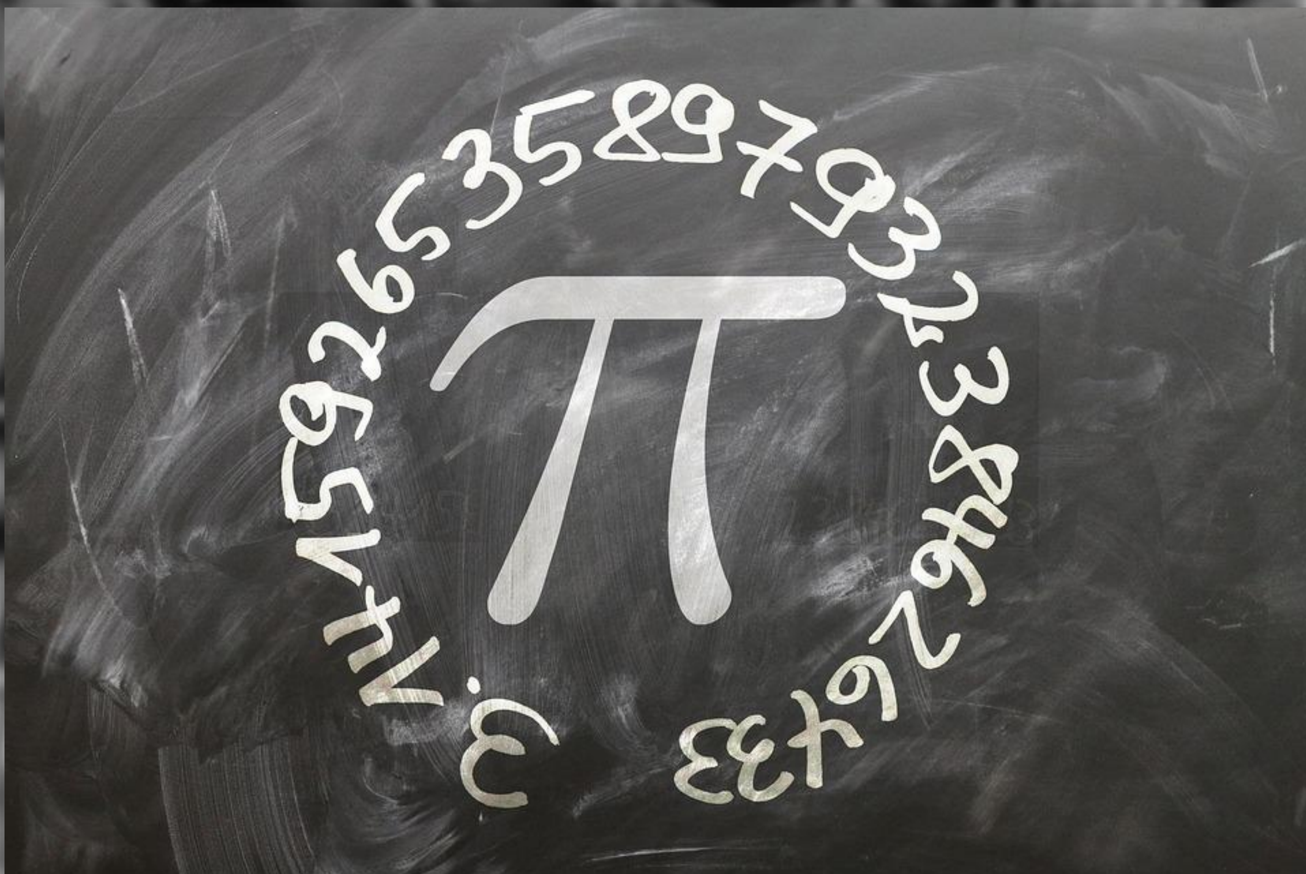

মার্চ মাসের একটি বিশেষত্ব হল পাই দিবস। পুরো বিশ্বের গণিতপ্রেমীদের জন্যই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এই পাই দিবস নিয়ে আলোচনার শুরুতে বলে নিই, পাই কি জিনিস। পাই মূলত গণিতের একটি ধ্রুবক। ইউক্লিডিয় সমতলীয় জ্যামিতিতে, বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে π হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সহজে বললে যেকোনো বৃত্তের পরিধিকে ব্যাস দ্বারা ভাগ করলে পাই পাওয়া যাবে। এখানে জানা জরুরি যে, এটি যেহেতু ধ্রুবক সেহেতু যেকোনো বৃত্তের ক্ষেত্রেই এই অনুপাত একই হবে তথা, পাই-এর মান সর্বদাই একই হবে।

পাই এর চিহ্ন ও মান

পাই নিয়ে অনেক আলোচনাই তো হল, এবার নাহয় এর চিহ্নটি দেখা যাক। পাই-কে π প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

π-এর মান হল ৩.১৪১৫৯২ .... (এটি এভাবে অসীম পর্যন্ত চলবে)। তবে দৈনন্দিন কাজে আমরা π-এর মান হিসেবে ৩.১৪১৬-কে ব্যবহার করে থাকি। এখানে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি। π-এর মান হিসেবে ২২/৭ এটি প্রচলিত ছিল। তবে এটি ভুল। ২২/৭ এর মান π এর চেয়ে বড়। [1]

বিশ্ব পাই দিবস

পাই দিবস দিবস গাণিতিক ধ্রুবক π-এর সম্মানে উদযাপিত দিবস। পাই-এর মান প্রায় ৩.১৪ বলে প্রতি বছর মার্চ ১৪ (মার্চ = ৩ ও তারিখ = ১৪) তারিখে পাই দিবস হিসাবে পালিত হয়।

আবার, পাই মুহূর্ত মার্চ ১৪, দুপুর ১টা ৫৯ মিনিটে উদযাপন করা হয়। ঐ দিন দুপুর ১টা ৫৯ মিনিটকে পাই মিনিট নামে আখ্যায়িত করা হয়। দুপুর ১টা ৫৯ মিনিট ২৬ সেকেন্ডকে পাই সেকেন্ড বলা হয়। পাই সেকেন্ডে পাই দিবস পালনের মধ্য দিয়ে পাই-এর মানের (৩.১৪১৫৯২৬) কাছাকাছি সময়ে দিবসটি উদযাপন করা সম্ভব হয়। [2]

সূত্র: [1] https://bit.ly/3rESJXh, https://en.wikipedia.org/wiki/Pi

যা জানা জরুরি

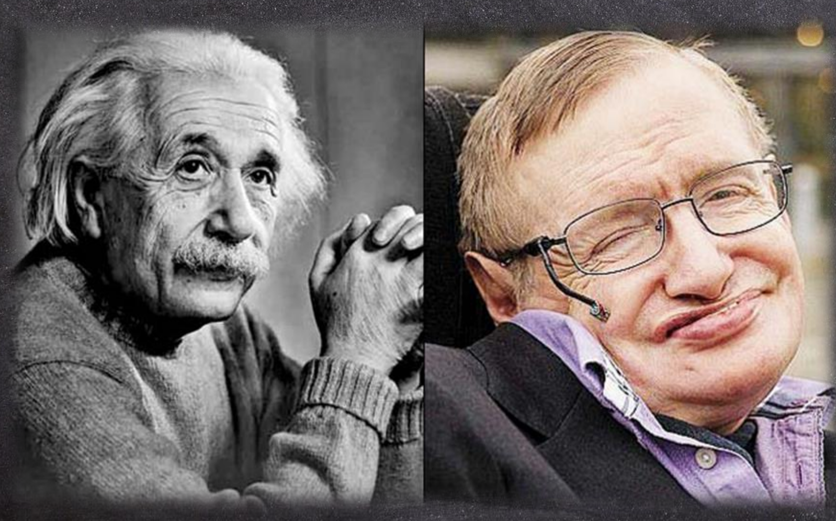

পাই দিবস অর্থাৎ মার্চের ১৪ তারিখে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্মদিন এবং একই সাথে স্টিফেন হকিংয়ের মৃত্যুদিন। ফলে দিনটি বিজ্ঞান-মহলে একইসাথে যেমন আনন্দের, তেমনি দুঃখেরও বটে।

সূত্র: https://bit.ly/3u5d2yC

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

এমপেম্বা ইফেক্ট

শিফাজ আহমেদ

সাধারণভাবে গরম পানির চেয়ে ঠাণ্ডা পানির দ্রুত বরফে পরিণত হবার কথা। পদার্থ তরল থেকে কঠিনে পরিণত হতে দুটি ধাপ পার হয়। প্রথমে তরলটি যে তাপমাত্রায় আছে সে তাপমাত্রা থেকে গলনাংক তাপমাত্রায় পৌঁছবে, তারপর তাপমাত্রা পরিবর্তন না করেই সুপ্ততাপের প্রভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। পানির ক্ষেত্রে , ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানি প্রথমে ১০ ডিগ্রি থেকে শূন্য ডিগ্রিতে নামবে, তারপর শূন্য ডিগ্রিতেই পানি থেকে বরফে পরিণত হবে। তাপমাত্রা আরো কমালে বরফের তাপমাত্রা আরো কমবে।সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার পানির মধ্যে যে পানির তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির যত কাছে সেটি আগে বরফে পরিণত হবে। কিন্তু এমপেম্বা ইফেক্টে ঘটে উল্টো ঘটনা। এর প্রভাবে গরম পানি আগে বরফ হবে আর ঠান্ডা পানি হবে তার পরে!

১৯৬৩ সালে আফ্রিকার তানজানিয়ার ১৩ বছরের এক স্কুল বালক, এরাস্তো এমপেম্বা, আইসক্রিম বানাতে গিয়ে পানির এক অদ্ভুত আচরণ খেয়াল করেন। আইসক্রিম বানানোর সময় খেয়াল করেন যে পানি গরম করলে ঠান্ডা পানির চেয়ে দ্রুত বরফ হয়ে যায়। স্কুলের সবাইকে এ কথা বললে তারা তার কথা বিশ্বাস করেননি। কয়েক বছর পরে হাই স্কুলে পড়ার সময় পদার্থ বিজ্ঞানের একজন প্রফেসর, ড. ডেনিস অসবর্ন, তাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তার শিক্ষক আর সহপাঠীরা তার কথা মেনে না নিলেও ড. অসবর্নকে এ বিষয়ে করতে সক্ষম হন এবং ড. অসবর্ন ল্যাবে এই ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি খেয়াল করেন, বাস্তবেও ঠান্ডা পানির চেয়ে গরম পানি আগে বরফে হতে পারে! তবে সেটি প্রতিবারই হয় এমন নয় বরং মাঝে মধ্যে পানির এই অদ্ভুত ধর্ম লক্ষ্য করেন তিনি। এরপর ১৯৬৯ সালে এমপেম্বা ও ড. অসবর্ন এই ব্যাপারে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

অনেক আগেই অ্যারিস্টটল পানির এই অদ্ভুত আচরণ খেয়াল করেছিলেন। তিনিই খুব সম্ভবত প্রথম এই ব্যাপারে লিখে গিয়েছেন খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালে। তার লেখা থেকে জানা যায়, পানি অনেক সময় নিয়ে গরম করলে ঠান্ডা পানির চেয়ে দ্রুত বরফ হয়ে যায়। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ফ্রান্সিস বেকন পানির এই অদ্ভুত আচরণ খেয়াল করেছিলেন। বিখ্যাত গণিতবীদ রেনে ডেকার্টও, কার্টেসিয়ান স্থানাংক ব্যবস্থা যার নামে নামকরণ করা হয়েছে, পানির এই আচরণ খেয়াল করেছিলেন।

পানির এই আচরণ আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে পড়ে এমপেম্বা ড. অসবর্নের সাথে পেপার পাবলিশ করার পরে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই এ ব্যাপারে কোনো পরিপূর্ণ ব্যাখা দিতে পারেননি! আর এর পেছনে রয়েছে 'পানির বরফ হওয়া' শব্দগুচ্ছ। পানি শূন্য ডিগ্রিতে পৌঁছালেই বরফে পরিণত হয় না, প্রথমে বরফের ছোট ছোট ক্রিস্টাল তৈরি হয়, তারপর সেটিকে কেন্দ্র করে পানি জমাট বাঁধে। এখন বরফ হওয়া বলতে প্রথম ক্রিস্টাল গঠন হওয়া নাকি পুরো পানি বরফে পরিণত হওয়া সেটির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই।

পুরো ব্যাপারটির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলেও এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি হাইপোথিসিস আছে এ ব্যাপারে।

- পানি স্ফুটনাংকে থাকলে কিছু পানি বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে চলে যায়, ফলে পাত্রে থাকা পানির ভর কমে যায়। একই পরিমাণ পানি দুটি আলাদা বিকারে নিয়ে একটিকে ঘরের তাপমাত্রায় রাখা হয় আর আরেকটিকে স্ফুটনাংকের তাপমাত্রায় তাপ দেয়া হয় তাহলে তাপ দেয়াটি থেকে কিছু হলেও পানি বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। ফলে সেই বিকারের পানির ভর একটু হলেও কমে যাবে। আর ভর কমে যাবার কারণে গরম করা পানি আগে বরফ হয়ে যায়। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু সফল পরীক্ষা হলেও তাত্ত্বিকভাবে হিসেব মেলানো সম্ভব হয় না। ফলে শুধুমাত্র ভর কমে যাওয়া একমাত্র কারণ হতে পারে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

- আরেকটি ব্যাখ্যা পানিতে দ্রবীভূত গ্যাসের পানি থেকে বের হয়ে যাওয়া। পানিতে সবসময় বিভিন্ন গ্যাস দ্রবীভূত থাকে। যখন পানিকে গরম করা হয় তখন এসব গ্যাস ধীরে ধীরে বের হয়ে যেতে থাকে। ফলে এই গরম পানিতে ঠান্ডা পানির চেয়ে কম গ্যাস থাকে। ফলে যখন এসব গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে তখন পানির হিমাংক তখন বেড়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত থাকলে পানির হিমাংক -১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যাতে পারে। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বের করে দিতে পারলে পরিপূর্ণ

বিশুদ্ধ পানির মতো হিমাংক আবার শূন্য ডিগ্রি হয়ে যায়। ঠিক এরকমভাবেই গ্যাস বের হয়ে যাবার কারণে স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন হতে পারে বলে অনেকেই মত দিয়েছেন।

২০১২ সালে রয়াল সোসাইটি অব ক্যামেস্ট্রির প্রতিযোগীতায় প্রায় ২২ হাজার প্রতিযোগী এমপেম্বা ইফেক্টের ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাদের মধ্যে নিকোলা ব্রেগোভিচকে এমপেম্বা বিজয়ী হিসেবে বেছে নেন।

- তিনি এর আগের পানির বাষ্প হওয়া আর দ্রবীভূত গ্যাসের সাথে নতুন দুটি ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেন। একটি হচ্ছে পরিচলনের ফলে সৃষ্ট স্রোত এবং সুপারকুলিং। গরম পানিকে ঠান্ডা পরিবেশে রাখলে পাত্রের কিনারা দ্রুত ঠান্ডা হয়, কিন্তু মাঝের পানির তাপমাত্রা বেশি থাকে। এর ফলে ভিন্ন তাপমাত্রার পানির একটি স্রোত তৈরি হয়, যা এমপেম্বা ইফেক্টে প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে পানি বরফ হবার আগে এর একটি অংশের তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে নেমে যায়, সেখানে তৈরি হয় ছোট একটি ক্রিস্টাল। তাপমাত্রার এই নেমে যাওয়া হচ্ছে সুপারকুলিং, যা পানি জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

এই থিওরিও এমপেম্বা ইফেক্ট ব্যাখার জন্য পরিপূর্ণ না। কী কারণে ঠান্ডা পানির চেয়ে গরম পানির সুপারকুলিং কম হচ্ছে এটাও একটা প্রশ্ন রয়ে যায়।

- নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির জি ঝাং এবং তার গবেষক দল নতুন একটি ব্যাখা দিয়েছেন। তাদের থিওরির মূল হচ্ছে পানির ব্যতিক্রমী রাসায়নিক বন্ধন। দুটি হাইড্রোজেন আর একটি অক্সিজেন নিয়ে পানির সমযোজী বন্ধন তৈরি হয়। কিন্তু পানির সাথে এ রকম অন্যান্য যৌগের একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন। হাইড্রোজেন বন্ধন সমযোজী বন্ধনের চেয়ে কম শক্তিশালী হলেও এই হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণেই পানির স্ফুটনাঙ্ক বেশি হয়।এই থিওরি অনুযায়ী হাইড্রোজেন বন্ধন পানির এই ব্যতিক্রম আচরণের জন্য দায়ী।হাইড্রোজেন বন্ধন পানির অণুগুলোকে কাছাকাছি আটকে রাখে। পানিকে যখন তাপ দেয়া হবে তখন এই হাইড্রোজেন বন্ধন ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে শুরু করবে এবং পানির অণুগুলো একটি আরেকটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। এরপর যখন আবার ঠান্ডা করা হবে তখন হাইড্রোজেন বন্ধন আবারো আগের মতো হাইড্রোজেন অণুগুলোকে কাছাকাছি আনবে। এসময় হাইড্রোজেন বন্ধন যে এনার্জি ছেড়ে দেবে সেটাকেই গরম পানির দ্রুত বরফ হবার কারণ হিসেবে বলেছেন সিঙ্গাপুরের বিজ্ঞানীর দল। তারা তাদের থিওরি প্রমাণের জন্য গরম ও ঠান্ডা পানির মলিকুলার এক্টিভিটির একটি হিসাব দেখিয়েছেন।

২০১৬ সালে বুরিজ ও লিনডেন তাদের গবেষনাপত্রে এমপেম্বা ইফেক্টকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। তাদের মতে, পানির ভর নিতে কিংবা তাপমাত্রা পরিমাপের ভুলের কারণে মনে হতে পারে গরম পানি দ্রুত বরফ হচ্ছে। বুরিজ ও লিনডেন সহ আরো অনেকেই বেশ কিছু ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। পানির উৎস, পানি রাখার পাত্র, তাপের উৎস, ঠান্ডা কিভাবে করা হচ্ছে- এরকম হাজারো ব্যাপার থাকতে পারে যেগুলোর কারণে হয়তো আপাতত দৃষ্টিতে একই পানি বেশি তাপমাত্রা থেকে দ্রুত বরফ হচ্ছে বলে মনে হয়। তবে যারা এমপেম্বা ইফেক্ট নিয়ে কাজ করেন তারা এখনই হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন বলেই জানিয়েছেন।

সূত্র: https://bit.ly/31DSXDk

অ্যাপ রিভিউ

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

একসময় ফোন কল ছিল অফলাইন প্রযুক্তি। হয় মোবাইল নাহয় টেলিফোন, এই দুই উপায়ে যোগাযোগের কাজটা সেরে ফেলতাম। কিন্তু যুগ বদলেছে। এসেছে ভিওআইপি তথা ভয়েস ওভার আইপি প্রযুক্তি। ফলে আরো সহজ হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। আজ তেমনই ১টি ‘ইন্টারনেট কলিং অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ’ নিয়ে কথা বলব, যেগুলো বেশ সুবিধাজনক ও নিরাপদ।

Alaap - BTCL Calling App

এটা একটা চমক বলতে পারেন। প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সরকার ভিওআইপি সার্ভিস চালু করল। বিটিসিএল তথা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেড এটি কয়েকদিন আগেই প্রকাশ করেছে। এটার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, এতে আপনাকে একটি কাস্টম মোবাইল নাম্বার দেয়া হবে! অন্যান্য যত কলিং অ্যাপ ব্যবহার করছেন, সেগুলোতে এই সুবিধাটি নেই। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, সাধারণ নাম্বারে কল দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে সেই নাম্বারে এই

অ্যাপ কিংবা ইন্টারনেট চালু থাকতে হবে না! আর, সাইন আপ করলেই শুরুতে পাবেন ১৫ মিনিট বোনাস (১ মাস মেয়াদ)। আশা করি, এতটুকুই যথেষ্ট।

চলুন ফিচারগুলো দেখে নিই:

১. কাস্টম নাম্বার: আপনাকে একটি কাস্টম মোবাইল নাম্বার দেয়া হবে। যার শুরুটা হবে ০৯৬ দিয়ে।

২. বিনামূল্যে কল: অন্যান্য সব অ্যাপের মত এটা দিয়েও বিনামূল্যে অডিও এবং ভিডিও কল করা যাবে।

৩. কল রেকর্ড করা: কল রেকর্ডিং যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সুবিধা, তা বলতেই হয়। কিন্তু অন্যান্য যেসব কলিং অ্যাপ আছে তাতে কিন্তু সেই সুবিধা নেই। এক্ষেত্রে এটি ব্যতিক্রম।

৪. ব্যাকআপ সুবিধা: শুধু রেকর্ড করলেই তো হবে না, সেগুলোর ব্যাকআপ সুবিধাও প্রয়োজন। এতে রয়েছে ব্যাকআপ সুবিধা। ফলে আপনার রেকর্ড ফাইলগুলো সহজেই সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন গুগল ড্রাইভে।

৫. কম খরচে কল: ভ্যাটসহ মাত্র ৩৪/সেকেন্ড খরচে যেকোনো বাংলাদেশি নম্বরে কল করা যাবে। এতে সেই নাম্বারে আলাপ অ্যাপ বা ইন্টারনেট সংযোগ থাকা লাগবে না।

৬. কল ফরোয়ার্ডিং: সবসময় হয়ত আপনার ইন্টারনেট চালু থাকবে না কিংবা অ্যাপে থাকবেন না। সেক্ষেত্রে এই সুবিধা ব্যবহার করে, আপনার আলাপে কল দিলে সেটাকে আপনার যেকোনো সিমের নাম্বারে ফরোয়ার্ড করে দিতে পারবেন চার্জের বিনিময়ে।

৭. মেসেজিং: শুধু কল নিয়েই বললাম। অথচ এর আছে মেসেঞ্জার সুবিধা। সহজেই বন্ধু বা পরিবারের সাথে বিনামূল্যে চ্যাট করতে পারবেন।

৮. ভাষা: বাংলাদেশি অ্যাপে বলে কথা। বাংলা ভাষার ব্যবহার রয়েছে এতে।

৯. থিম: চ্যাটিংয়ের জন্য রয়েছে সুন্দর কিছু থিম।

১০. ভিডিও স্ট্রিমিং: এইচডি কোয়ালিটির ভিডিও স্ট্রিম করতে পারবেন। নতুন চলচ্চিত্র, নাটক ও গান, সবই মিলবে এখানে।

১১. নিউজফিড: ছোটখাটো সোশ্যাল মিডিয়ায় যা থাকে সবই আছে এখানে। ফলে সাথে নিউজফিডের সুবিধাও আছে।

১২. রেফারাল: বন্ধুদেরকে রেফার করলে আপনি ক্রেডিট পাবেন। যা কথা বলার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

অ্যাপের তথ্যাদি

নাম: Alaap - BTCL Calling App

রেটিং: ৪.২

ইনস্টলের সংখ্যা: ৫০,০০,০০০+

ডাউনলোড লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alaap.app

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হতে চান? তাহলে আজই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করুন এই লিংকে ক্লিক করে। তারপর আমাদের গ্রুপে লেখালেখি করুন এবং https://scienceclub.shikkhaweb.com এ গিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে লেখালেখি শুরু করে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করুন।

দ্য এইজ অব এআই

ওয়াশিক রহমান

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের চিন্তা ভাবনাগুলোকে কৃত্তিম উপায়ে কম্পিউটার বা কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রের মধ্যে রূপ দেয়ার ব্যবস্থা। এটি হলো এক ধরনের সফটওয়্যার টেকনোলজি যা মানুষের মতোই রোবট অথবা কম্পিউটারকে কাজ করায় এবং ভাবায়। বর্তমানে আমাদের আশেপাশেই রয়েছে এগুলোর দৈনন্দিন ব্যবহার। যেমন রয়েছে আমাদের সকল স্মার্টফোনে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিরি, ক্যাপচা রিকগনিশন, চ্যাটবটস্ ইত্যাদি। এই প্রযুক্তির নির্মাণে যে জিনিসটা সবথেকে বেশি প্রয়োজন সেটি হল অ্যালগরিদম।

অ্যালগরিদম হ'ল সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত,কম্পিউটার-বাস্তবায়িত নির্দেশাবলীর সীমাবদ্ধ ক্রম এবং সাধারণত কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ছোট ছোট ধাপ অনুসরণ করে।অ্যালগরিদম সর্বদা দ্ব্যর্থহীন থাকে এবং গণনা, ডেটা প্রসেসিং, স্বয়ংক্রিয় যুক্তি সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্টকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যালগরিদম শব্দটি এসেছে নবম শতাব্দীর মুসলিম গণিতবিদ Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī এর নাম থেকে।যেটাকে পরবর্তীতে ল্যাটিন শব্দ 'অ্যালগোরিদম' এ রূপান্তর করা হয়। আর এই অ্যালগোরিদমের সাহায্যেই বর্তমান গণিত বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান এর মূলভিত্তি স্থাপিত।আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা প্রায় ২৪ ঘণ্টাই যন্ত্রপাতিতে ঘেরা। আর যন্ত্রপাতির উল্লেখযোগ্য একটা অংশ বুদ্ধিমান, যেমন: আমাদের ফোন, কম্পিউটার, স্মার্টওয়াচ ইত্যাদি। সাথে অতি প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট তো আছেই। এগুলোর সবই চলে অ্যালগরিদম দিয়ে। আমাদের নিত্যব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবে রয়েছে অনেক জটিল জটিল অ্যালগরিদম। এই অ্যালগরিদমগুলো এতই বুদ্ধিমান যে আমরা কখন কী দেখতে চাই, কী দেখতে চাই না তা অনুমান করতে পারে।

এ.আই এর যাত্রা ও ইতিহাস:

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার পথচলা শুরু ১৯৪০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সময় ব্রিটিশ গণিতবিদ অ্যালান টুরিং এবং নিউরোলজিস্ট গ্রে ওয়াল্টার বুদ্ধিমান মেশিন এবং তার বিভিন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি কোড ভাঙাটা খুবই জরুরি ছিল। কিন্তু পারা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত পারলেন অ্যালান টুরিং। ব্রিটিশ সরকার আইন করে তাদের নাৎসি কোড ভাঙার তথ্য সারা পৃথিবীর কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিল।

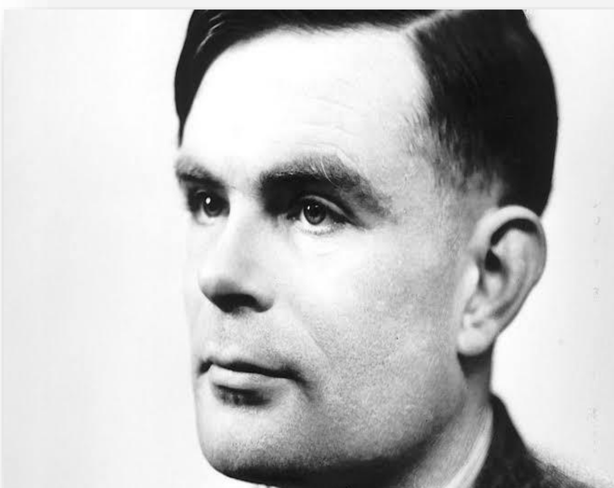

কিংস কলেজ থেকে গণিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে অনার্সে উত্তীর্ণ হন টুরিং এবং ফেলোশিপ পান। তিনি মনে করতেন, যেকোনো গণনাযোগ্য গাণিতিক সমস্যাই সমাধানযোগ্য। যদি তা অ্যালগরিদমে দেয়া হয়। এই সমাধানের জন্য 'ইউনিভার্সাল টুরিং মেশিন' নামে একটি 'হাইপোথেটিক্যাল' যন্ত্র

তৈরি করেন টুরিং। এই মেশিনের আধুনিক রূপই হচ্ছে আজকের কম্পিউটার। প্রিন্সটন থেকে পিএইচডি করার সময় টুরিং ক্রিপ্টোলজি নিয়েও পড়াশোনা করেন।

টুরিং তখন ব্রিটিশ কোড ব্রেকিং সংস্থায় কাজ করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সে সময় ধ্বংসাত্মক আকার নিয়েছে। আক্রান্ত পোল্যান্ড তখন বাধ্য হয়েই সাহায্যের আশায় উদ্ধার করা জার্মান এনিগমার তথ্যাবলি ব্রিটিশদের সরবরাহ করে।

Enigma হলো একটি গোপন বার্তা প্রেরণকারী যন্ত্র। যার মাধ্যমে জার্মানরা রেডিও সঙ্কেত দিয়ে দুর্বোধ্য কোডে সৈন্যদের কাছে আক্রমণের নির্দেশিকা পাঠাত। কোডগুলি মিত্রবাহিনী পেলেও তা ভাঙতে পারছিল না ব্রিটিশরা।

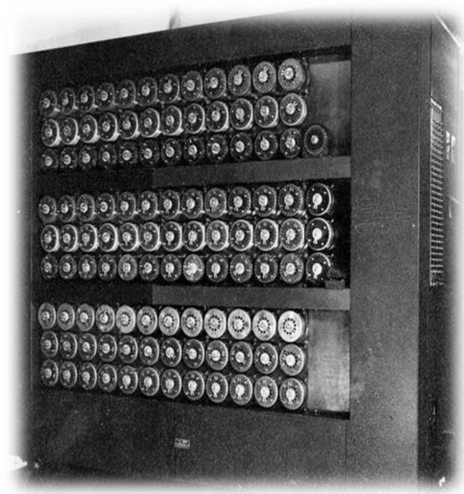

এনিগমার গোপন বার্তা উদ্ধারকাজে তখন ক্রিপ্টো বিশেষজ্ঞ টুরিংকে কোড ব্রেকিং কার্যালয়ে ডাকা হলো। এনিগমার কোড ভাঙার জন্য যে ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল, সেটা 'বোম্বা' নামের যন্ত্রটি পোলিশদের কাছ থেকেই পাওয়া। টুরিং ভাবলেন, 'মানুষের দ্বারা এনিগমাকে হারিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। বরং একটি যন্ত্রের পক্ষেই সেটি সম্ভব। টুরিং ও গর্ডন ওয়েলচের যৌথ চেষ্টায় 'বোম্বা'কে ভিত্তি করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক যন্ত্র তৈরি হলো। নাম 'বোম্বে'। এনিগমার সব কোডের ভেতর পরিচিত শব্দ খোঁজার চেষ্টা করত 'বোম্বে'। এভাবেই জার্মান এনিগমার গোপন তথ্য উদ্ধার করে ক্রিপ্টোগ্রাফি জগতের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন টুরিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে 'বোম্বে' একে একে জার্মান সেনাবাহিনীর সব এনক্রিপ্টেড তথ্য ভাঙতে শুরু করে। আটলান্টিকে নাৎসিদের হেরে যাওয়ার ঘটনাটিও ঘটে বোম্বের অভাবনীয় সাফল্যের কারণেই।

১৯৪৮ সালের দিকে 'টুরিং টেস্ট ও যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' নিয়ে কাজ শুরু করেন টুরিং। এই টেস্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল অনুলিপিকরণ পরীক্ষা। অর্থাৎ 'ইমিটেশন গেম'। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পাশাপাশি দুটি রুমের কথা। একটিতে একজন মানুষ, আরেকটিতে রয়েছে একটি যন্ত্র। ঠিক করা হয়, বৌদ্ধিক বিভিন্ন প্রশ্ন লিখে পাঠালে এর জবাব ওই দুই রুম থেকেই লিখিতভাবে আসবে। কোনো শব্দ বা কণ্ঠের ব্যবহার করা যাবে না। যন্ত্রটির উত্তর মানুষের কাছাকাছি হলেই বুঝতে হবে তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আছে।

আমরা প্রতিনিয়তই এই টুরিং টেস্টের মুখোমুখি হচ্ছি। যেমন ক্যাপচা রিকগনিশন করার সময় আমরা রোবট না মানুষ, তার পরীক্ষা হয় এ টুরিং টেস্টের মাধ্যমেই। যন্ত্র বা রোবট ক্যাপচার অক্ষরের ক্যাপিটাল বা স্মল লেটার যাচাই করতে পারে না। একটি যন্ত্র বিভিন্ন 'ট্রিকি' প্রশ্নের, অর্থাৎ যেখানে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন পড়ে, সেসব উত্তরগুলো দিতে পারে না। কোনো যন্ত্র কী চিন্তা করতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই ছিল এ টেস্টের মূল উদ্দেশ্য। একটি যন্ত্র বা রোবট কখনোই তার সঠিক অনুভূতির উত্তর লিখতে পারবে না। এর মাধ্যমেই মানুষ থেকে যন্ত্রের পার্থক্য করা সম্ভব। টুরিং টেস্ট সে হিসেবে আজও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কোনো যন্ত্র পায়নি।এরপর কয়েক বছর পর ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের MIT এর John McCarthy সর্বপ্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

শব্দটি উল্লেখ করেন। তিনি ছিলেন মার্কিন কম্পিউটার ও কগনিটিভ বিজ্ঞানী। এমনকি, এআই প্রযুক্তির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। ক্রমেই এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে কম্পিউটারে চিন্তাভাবনাগুলো মানুষের মতই হয় মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না কিন্তু কম্পিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে একই সময়ে বিভিন্ন কাজ দ্রুত করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে যন্ত্রের মধ্যে যৌক্তিক চিন্তা জ্ঞান পরিকল্পনা যোগাযোগ উপলক্ষে এবং যন্ত্র চলাচল করার সামর্থ্য তাই প্রোগ্রামিং ভাষা LISP, PROLOG, C/C++, CLISP , Java ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ হল রোবট। প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটার DeepBlue এর কাছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু Garry Kasparov পরাজিত হন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুনিয়ায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজ ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ইন্টারনেট নির্ভর স্মার্ট ডিভাইসগুলোতে *এআইয়ের* ব্যবহার রমরমা।

বর্তমান বিশ্ব ডিজিটালাইজড করার জন্য এ আই এর ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। ছোটখাটো কাজ থেকে ভারী এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এগুলোর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে।কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই প্রযুক্তি আমাদের উপর কি প্রভাব ফেলবে এটার অনুমানও বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা কিছুটা করতে পারছেন। পরবর্তী পর্ব গুলিতে বিংশ শতাব্দীর শেষে এআই এর অগ্রগতি,উপকারিতা, ভবিষ্যৎ বিপর্যয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সূত্র: https://bit.ly/3drorC2

গোল্ডেন রেশিও (সোনালি অনুপাত, φ)

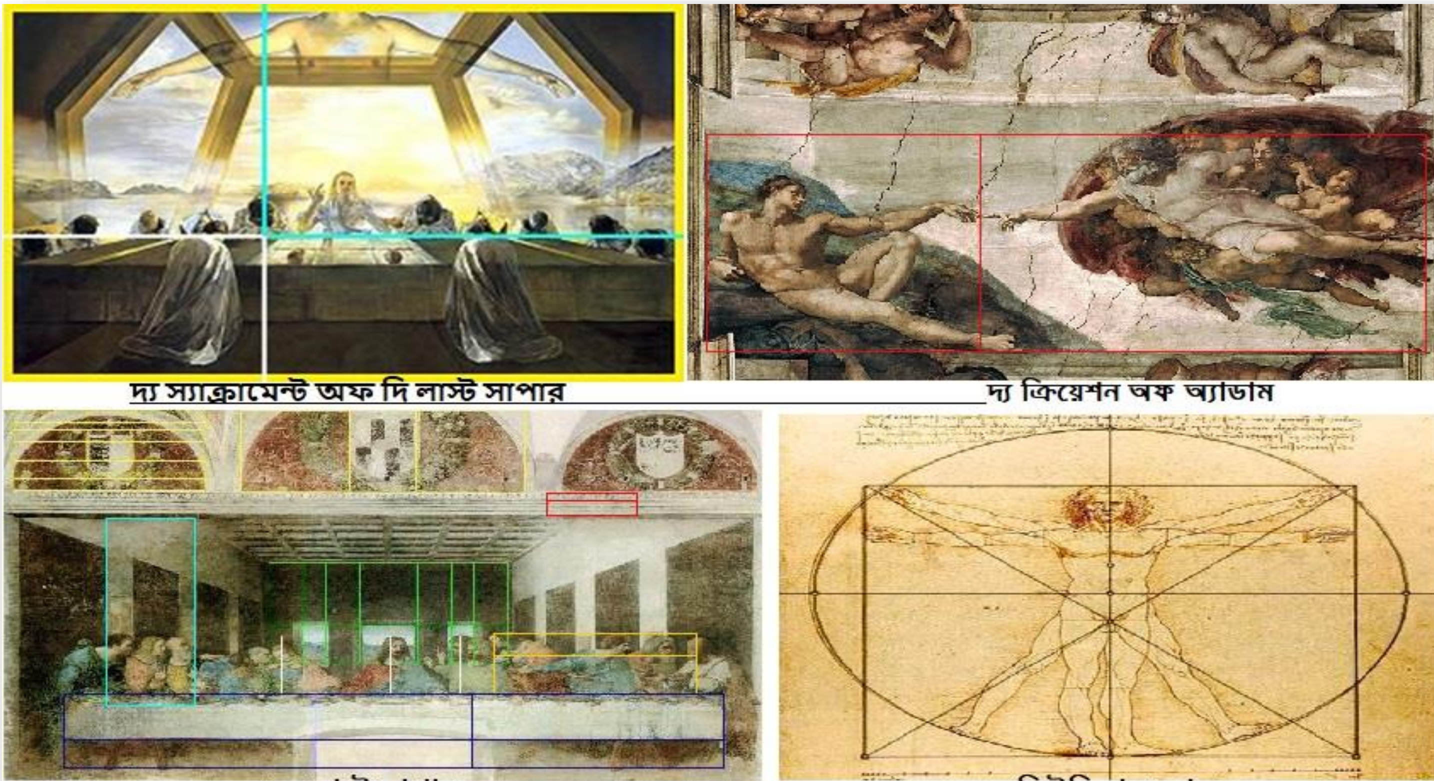

দ্য স্যাক্রামেন্ট অফ দি লাস্ট সাপার — দ্য ক্রিয়েশন অফ অ্যাডাম

দ্য লাস্ট সাপার — ভিট্রুভিয়ান ম্যান

লেখক

গনিত এই পৃথিবীর অন্যতম একটা বিষয়। যা ছাড়া আমরা কোন কিছুই কল্পনা করতে পারি না। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই গনিত অতি নিবিরভাবে জড়িয়ে রয়েছে।আমরা সবসময় কোন না কোনোভাবে গনিতকে না বুঝেই ব্যবহার করে যাচ্ছি। এই গনিতে একক ভাবে যে বিস্ময় রয়েছে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাইতো গনিত নিয়ে এত এত গবেষণা।এর আগে আমরা গনিতের একটা বিস্ময় π (পাই) নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। আজ তেমনই আরেকটা বিস্ময় (The Golden Ratio) গোল্ডেন রেশিও নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

প্রথমেই গণিতের একটি জাদু দিয়ে শুরু করা যাক। যে কোনো দুটি সংখ্যা ধরে নিয়ে এদের যোগফল বের করুন। প্রাপ্ত যোগফলটির সাথে ধরে নেওয়া দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে আবার যোগ করুন। এবার প্রতিটি যোগফলকে আগের সংখ্যা দিয়ে যোগ করতে থাকুন। এভাবে ২০তম সংখ্যা পর্যন্ত বের করে ২০তম সংখ্যাটিকে ১৯তম সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল পাবেন ১.৬০৮। যে কোনো সংখ্যা দিয়েই শুরু করা হোক না কেন, প্রতি ক্ষেত্রেই ফল আসবে ১.৬০৮। উদাহরণস্বরূপ ৫ এবং ২ সংখ্যা দুটিকে বিবেচনা করব।

৫+২ = ৭; ২+৭ = ৯; ৭+৯ = ১৬; ৯+১৬ = ২৫; ....

এভাবে ১৯ এবং ২০তম সংখ্যাটি পাওয়া যায় যথাক্রমে ১৩,১৫৩ এবং ২১,২৮২। ২১,২৮২-কে ১৩,১৫৩ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় ১.৬০৮। এই সংখ্যাটিকে বলা হয় গোল্ডেন রেশিও। এটি প্রকৃত অর্থেই একটি জাদুকরী সংখ্যা। গণিতে যতগুলো তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা আছে সেগুলোর মধ্যে গোল্ডেন রেশিও বা সোনালি অনুপাত একটি। বোঝাই যাচ্ছে, এটি একটি আনুপাতিক রাশি। এর মান ১.৬১৮০... এবং প্রকাশ করা হয় গ্রীক অক্ষর φ (ফাই) দ্বারা। এটি একটি অমূলদ সংখ্যা।

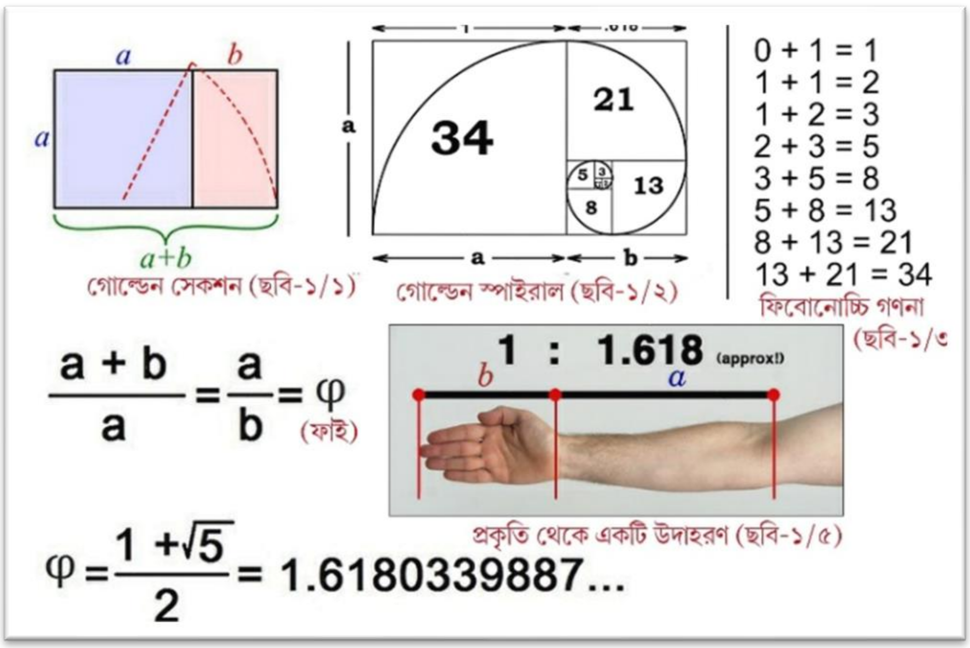

অর্থাৎ এটাকে দুটি পূর্ণসংখ্যার ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ করা যায় না।φ-কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। গণিতের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা পাই (π) অমূলদ সংখ্যা হলেও সেটাকে ২২/৭ ভগ্নাংশরূপে বেশ কিছু সংখ্যা পর্যন্ত সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়। এজন্য φ-কে বলা হয় গণিতের সর্বাধিক অমূলদ সংখ্যা।

দুইটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তর সংখ্যাটির সাপেক্ষে ঐ দুইটি সংখ্যার যোগফলের অনুপাত যদি ক্ষুদ্রতর সংখ্যার সাপেক্ষে বৃহত্তর সংখ্যার অনুপাতের সমান হয় তবে সংখ্যা দুইটি সোনালী অনুপাতে বিরাজমান।

a এবং b দুইটি সংখ্যার মধ্যে সোনালি অনুপাত বজায় থাকলে

$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi$ যেখানে a বৃহত্তর সংখ্যা এবং b ক্ষুদ্রতর সংখ্যা।

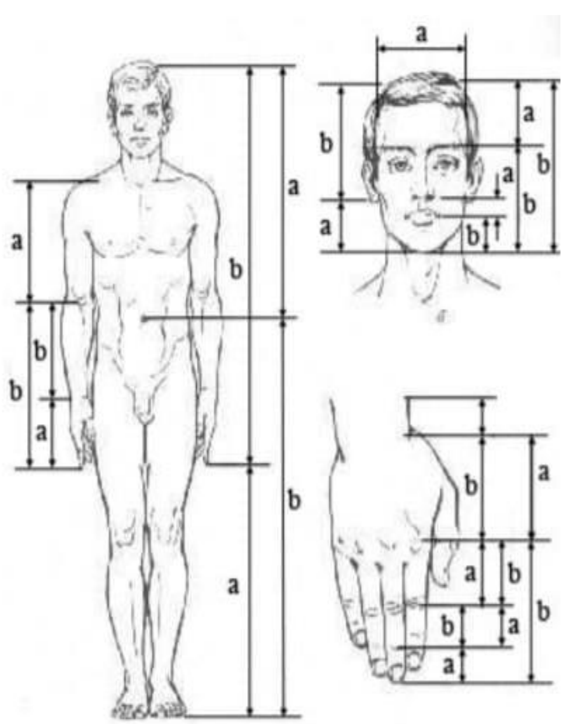

(ফাই) অক্ষরটি নেওয়া হয়েছে গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াস-এর নামের আদ্যক্ষর থেকে। বলা হয়, ফিডিয়াস (৪৮০-৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এথেনীয় পার্থানন-এর নকশা করেছিলেন সোনালি অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে। এর পর থেকেই সোনালি অনুপাতকে φ দ্বারা প্রকাশ করার রীতি চালু হয়। গোল্ডেন রেশিওকে গোল্ডেন সেকশন (Golden Section), গোল্ডেন মিন (Golden Mean), গোল্ডেন নাম্বার, ডিভাইন প্রোপরশন (Devine Proportion), ডিভাইন সেকশন (Devine Section), গোল্ডেন প্রোপরশন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। φ সম্পর্কে প্রাচীন মিসরীয়দের জানা-শোনা ছিল বলে মনে করা হয়। আনুমানিক ২৫৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি হওয়া প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটি-মিশরের পিরামিডে সোনালি অনুপাতের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এও সোনালি অনুপাতের অনুরূপ একটি জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা দেওয়া ছিল।

গোল্ডেন রেশিও এর বাবহার:

মানুষের মুখের ক্ষেত্রে গোল্ডেন রেশিও:

গোল্ডেন রেশিও বা "স্বর্গীয় অনুপাত" শব্দটির সাথে আমরা অনেকেই কম বেশি পরিচিত। কি অদ্ভুত!!! মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিই পরিকল্পনা মাফিক তৈরি। কোন সৃষ্টিই বিশৃঙ্খল ভাবে হয়নি। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত। আর এই অনুপাতই হল “স্বর্গীয় অনুপাত” বা গোল্ডেন রেশিও। এই পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র এবং বিশ্বভ্রম্মান্ড সবকিছুই আবর্তিত হয় এক সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে দিয়ে। আর সকল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে নিখুঁত সামঞ্জস্যতা। এই বিশ্বভ্রম্মান্ডের প্রতিটি বস্তুর নিখুঁত অবকাঠামোগত মান হচ্ছে ১,৬১৮। এই মানকে বলা হয় গোল্ডেন রেশিও। পৃথিবীতেযা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যেই এই অনুপাতটি আছে।

- মানুষের মুখের দৈর্ঘ্যের সাথে নাকের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ১.৬১৮ (প্রায়)
- মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কুনুইয়ের দৈর্ঘ্য এবং কব্জি থেকে কুনুইয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ১.৬১৮ (প্রায়)
- মানুষের নাভি থেকে পায়ের পাতার আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত এবং নাভি থেকে মাথা পর্যন্ত অনুপাত ১.৬১৮ (প্রায়)

এভাবে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গই এই অনুপাতে গঠিত।

জ্যামিতিক গঠন:

জ্যামিতিক গঠনগুলোকে এই অনুপাতে বিভক্তিকরণের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। যে কারণে বিশ্বব্যাপী আজও লোগোসহ বিভিন্ন ধরনের নকশা ও চিত্রকলায় গোল্ডেন রেশিওর ব্যবহার লক্ষণীয়। গোল্ডেন অনুপাত মেনে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক চিত্র আঁকা যায়। একটি চতুর্ভুজ এমনভাবে আঁকা সম্ভব যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ φ:১ অনুপাতে থাকে। এরূপ চতুর্ভুজ থেকে φ অনুপাতে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুর্ভুজ কেটে নিলে দেখা যায় ক্ষুদ্রতর চতুর্ভুজের বাহুগুলোও পরস্পরের সাপেক্ষে সোনালি অনুপাতে থাকে। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দুটি সমান বাহু ভূমির সাথে φ:১ অনুপাতে থাকে। তা ছাড়া ভূমির সাথে উৎপন্ন কোণদ্বয়ের একটিকে সমদ্বিখন্ডিত করলে সেটা বিপরীত বাহুকে φ:১ অনুপাতে বিভক্ত করে।

বিখ্যাত চিত্রকর্ম:

১৫০৯ সালে ইতালীয় গণিতবিদ ও অ্যাকাউন্টিং-এর জনক লুকা প্যাচিওলির লেখা ‘ডি ডিভাইনা প্রোপরশনি (De

divina proportione)' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর সংখ্যাটি অধিক পরিচিতি লাভ করে। বইয়ের জ্যামিতি ক চিত্রগুলো এঁকে দিয়েছিলেন রেনেসাঁর প্রবাদ পুরুষ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। সংখ্যাটির সাথে ভিঞ্চি যে খুব ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন তার জোরাল প্রমাণ এটা। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) তাঁর বহু শিল্পকর্মে সোনালী অনুপাত ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ভিট্রুভিয়ান ম্যান, দ্য লাস্ট সাপার ও মোনালিসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মাইকেলেঞ্জেলোর 'দ্য ক্রিয়েশন অফ অ্যাডাম', রাফায়েলের 'দ্য স্কুল অফ এথেন্স', বত্তিচেল্লির 'দ্য বার্থ অফ ভিনাস' সালভাদর ডালির 'দ্য স্যাক্রামেন্ট অফ দি লাস্ট সাপার'-ইত্যাদি বিখ্যাত সব চিত্রকর্মে গোল্ডেন রেশিওর ব্যবহার দেখা যায়।

প্রকৃতিতে সোনালী অনুপাত:

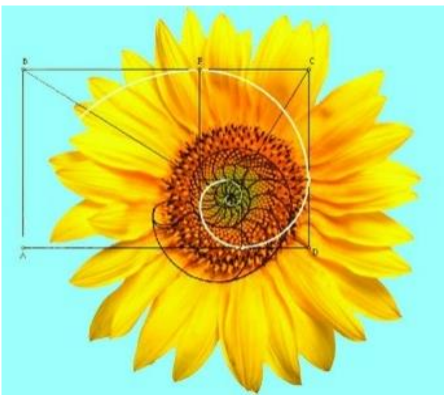

গোটা প্রানীকুলে-উদ্ভিদকুলে সব কিছুতেই মাত্রাগত ভাবে PHI বিদ্যমান।সূর্য মুখী ফুলের পাপড়ি ১.৬১৮ অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। মৌচাকে স্ত্রী মৌমাছি ও পুরুষ মৌমাছির সংখ্যার অনুপাত PHI। ফুলের ভেতর প্রতি স্তরে র রেনুর সাথে পরের স্তরের রেনুর অনুপাত PHI। গাছের প্রতি স্তরে স্তরে পাতা বৃদ্ধির অনুপাত PHI। শামুক-ঝিনুক-সী-শেল এর স্পাইরালেও কোন-না-কোনভাবে PHI রয়েছে, মাছের ঝাক, বন্য প্রানীর শিকার, সব কিছুতেই বিদ্যমান এই অনুপাত। চৌম্বকক্ষেত্র কিংবা বিদ্যুৎক্ষেত্রে, সরল ছন্দিত স্পন্দনে, তাপবিজ্ঞান, ফুলের মাঝে দেখা যায় PHI.

মানব স্থাপত্য ও শিল্পে:

বিক্ষ্যাত অনেক শিল্প, স্থাপত্যেও রয়েছে সোনালী অনুপাত, মিসরের পিরামিডে, আগ্রার তাজমহলে, ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারে, নটরডেমে, পারথেননে, ইউনাইটেড নেশন বিল্ডিং সহ আরও অজস্র স্থাপত্যে PHI ব্যবহৃত হয়েছে। বিক্ষ্যাত ছবি মোনালিসা, ম্যাডোনা অফ রকস, দ্যা লাস্ট সাপার, ভিট্রিভিয়ান ম্যান প্রভৃতি শিল্পেও পাওয়া গেছে সোনালী অনুপাত। কিছু বিখ্যাত কোম্পানির লোগোতেও PHI ব্যবহৃত হয়েছে।

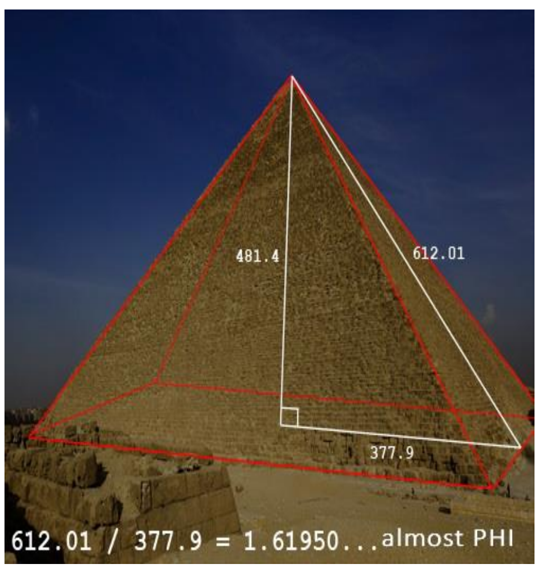

মহাবিশ্বে সোনালি অনুপাত:

হারিকেন, ঘূর্ণিঝড়, ধোঁয়ার কুণ্ডলী সবসময়ই Golden Spiral অনুসরন করে বৃদ্ধি পায়। এমনকি গ্যালাক্সি গুলোও Golden Spiral অনুসরন করে বিস্তৃত হয়। আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলোর সূর্যের চারপাশে আবর্তনকালও PHI অনুসরনে চলে। শনি গ্রহের বলয়ের ক্ষেত্রেও বাহিরের উজ্জ্বল বলয় ও ভেতরের অন্ধকার বলয় এর অনুপাত PHI। ঘুর্নিঝড় ও ছায়াপথেও রয়েছে সোনালী অনুপাত।

সূত্র: https://bit.ly/3m9XA1r, https://bit.ly/3u9fofY

শ্বেত গহ্বর

ফারহান কবির

আমাদের এই বিশাল মহাবিশ্বে বিভিন্ন ধরণের তারা-নক্ষত্রর পাশাপাশি রয়েছে অনেক কৃষ্ণ গহ্বর। কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোল হচ্ছে এমন একটি অঞ্চল যেখানে মাধ্যাকর্ষণ এতই শক্তিশালী যে কিছুই না-কণা এমনকি আলোও বার হতে পারে না। তাত্ত্বিকভাবে শ্বেত গহ্বর ব্ল্যাক হোলের পুরোপুরি বিপরীত।

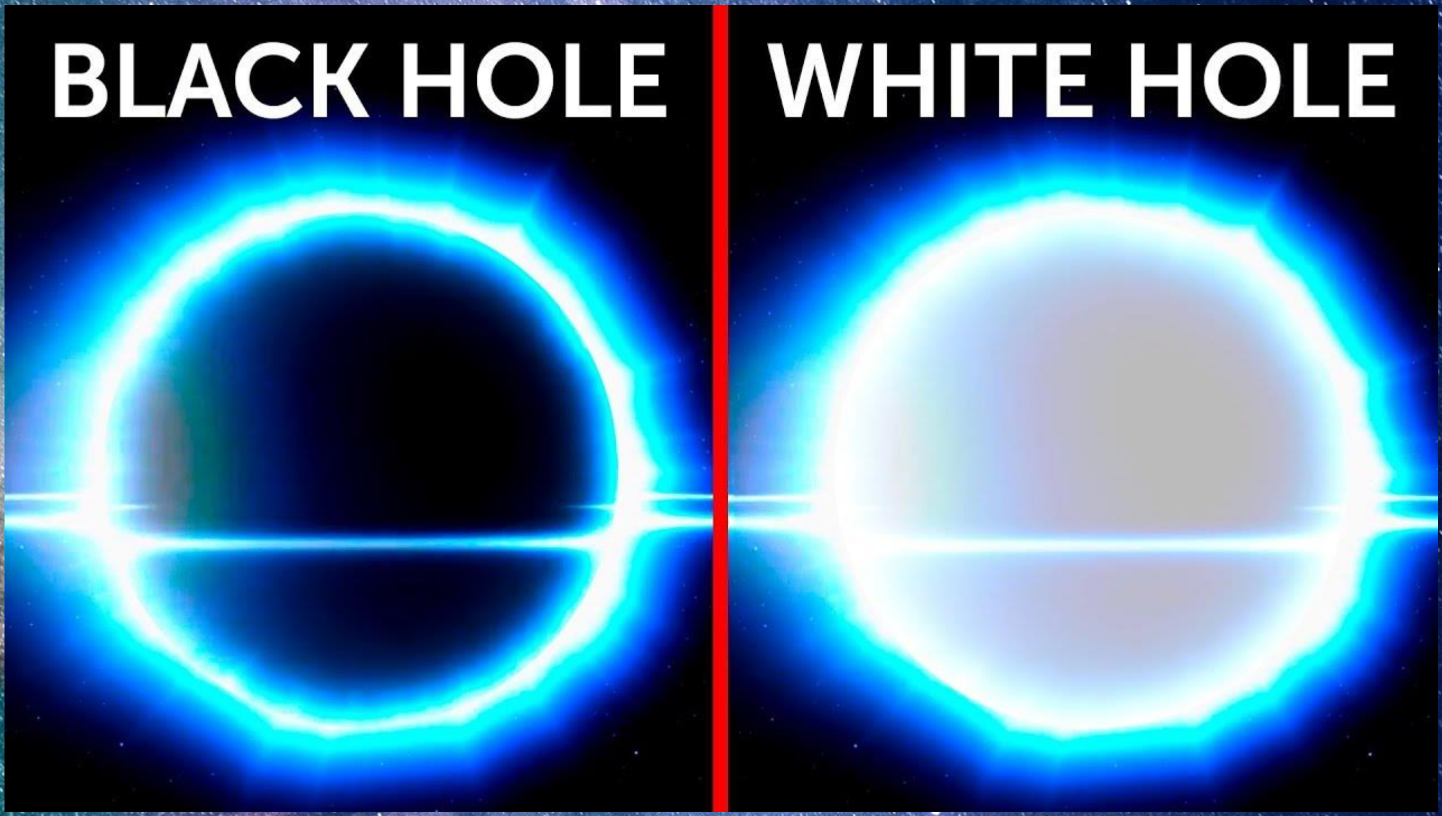

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব মতে; শ্বেত গহ্বর হচ্ছে স্থানকাল ও একাকীত্বের একটি অনুমান অঞ্চল যা বাইরে থেকে প্রবেশ করা যায় না কিন্তু পদার্থ, আলো শ্বেত গহ্বর থেকে বার হতে পারে। শ্বেত গহ্বরের প্রথম উপস্থিতি পাওয়া যায় "চিরকালীন কৃষ্ণ গহ্বর" তত্ত্বে। আপাত দৃষ্টিতে কৃষ্ণ গহ্বর সব কিছু গ্রাস করে ফেলে এবং এ থেকে কোনো কিছু বার হতে পারে না কিন্তু বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর মতে কৃষ্ণ গহ্বর বিকিরণ করে, যা হকিং বিকিরণ নামে পরিচিত। ১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং এর তাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন।

হকিং বিকিরণ মূলত বোঝায় যে কৃষ্ণ গহ্বরগুলির তাপমাত্রা তাদের ভরের বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। অর্থাৎ একটি কৃষ্ণ গহ্বর যত ছোট হবে সেটি ততটা উজ্জ্বল হবে।

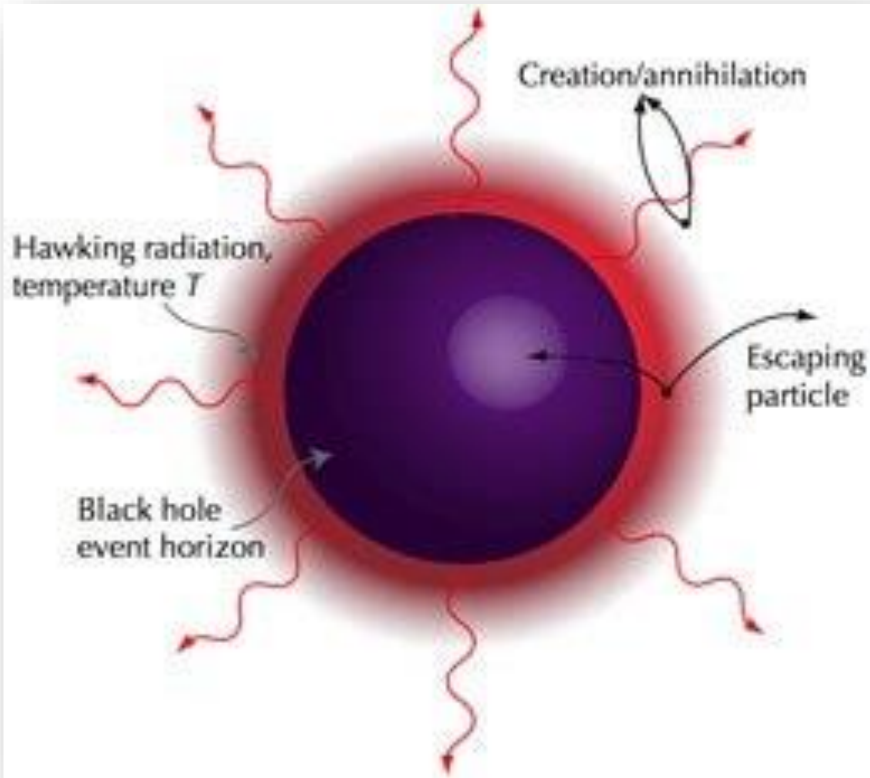

স্টিফেন হকিং এর এই পূর্বাভাসটি সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সম্মিলিত মডেল দ্বারা সমর্থিত। [1]

যেহেতু কৃষ্ণ গহ্বর থেকেও বিকিরণ সম্ভব(তাত্ত্বিকভাবে), সেহেতু আমরা একটা চিরন্তন কৃষ্ণ গহ্বর কল্পনা করতে পারি, যা থেকে কোনো কিছু এমনকি কোনো বিকিরণও হবে না। এই চিরন্তন কৃষ্ণ গহ্বর এর ধারনাটা আসে white hole বা শ্বেত গহ্বর থেকে। আর এই শ্বেত গহ্বর এর ধারণা প্রথম সামনে আনেন রাশিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ‘ইগর নভিকভ’ ১৯৬৪ সালে। এছাড়া আইনস্টাইন এর ক্ষেত্র সমীকরণেও শ্বেত গহ্বরের অস্তিত্বের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কি এই শ্বেত গহ্বর বা white hole?

শ্বেত গহ্বর হচ্ছে একটি উদ্ভট মহাজাগতিক যা অনেক উজ্জ্বল হয় এবং যেখানে কোনো পদার্থ প্রবেশ করলে অদৃশ্য হবার বদলে কুঁচকে যায়। শ্বেত গহ্বর মূলত হচ্ছে তাত্ত্বিক গাণিতিক ধারণা। শ্বেত গহ্বর, যা তাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণ গহ্বরের বিপরীত, মহাবিশ্বের রহস্যময় অন্ধকার পদার্থগুলোর একটি বড় অংশ নিয়ে গঠিত হতে পারে। কৃষ্ণ গহ্বরের মত শ্বেত গহ্বরও আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তথ্যের একটি পূর্বাভাস, যা বিপরীত কৃষ্ণ গহ্বরের মত কাজ করে। কৃষ্ণ গহ্বরের ঘটনা দিগন্ত থেকে যেমন কোন কিছু বাচতে পারে না, তেমনি শ্বেত গহব্বরে ঘটনা দিগন্তে প্রবেশ করতে পারে না। ধারণা করা হয় কৃষ্ণ গহ্বর এবং শ্বেত গহ্বর যত্রতত্র একে অপরের সাথে সংযুক্ত। ২০১৪ সালে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ কার্লো রোভেলি এবং তার সহকর্মীরা মত দেন যে, কৃষ্ণ গহ্বর এবং শ্বেত গহ্বর অন্যভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। যখন কোন কৃষ্ণ গহ্বরের মৃত্যু ঘটে তখন তারা শ্বেত গহ্বরে পরিণত হতে পারে। [2]

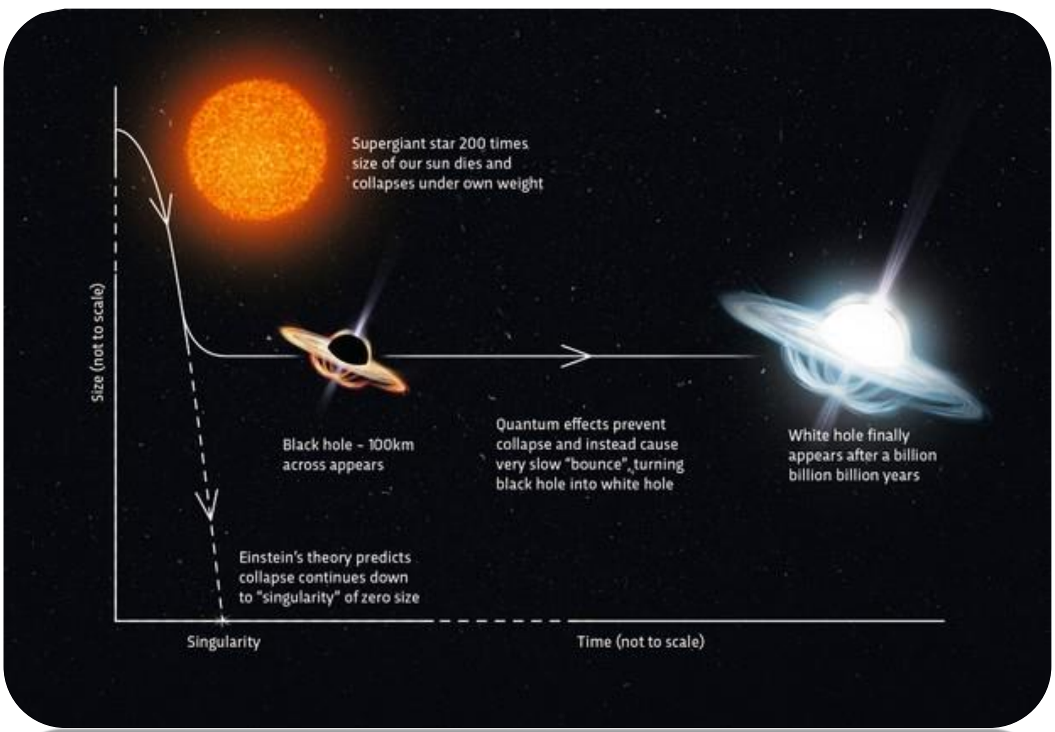

দূর থেকে দেখলে একটি শ্বেত গহ্বরকে কৃষ্ণ গহ্বর এর মতই দেখাবে। এর ভর আছে, এটি ঘুরতে পারে, ঘটনা দিগন্তের পাশে ধুলা জমতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানীরা শ্বেত গহ্বরকে কৃষ্ণ গহ্বরের ঘটনা বিপর্যয় বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

কৃষ্ণ গহ্বরকে মহাবিশ্বের সবচেয়ে ধ্বংসাত্বক বস্তুগুলোর একটি ধরা হয়। কারণ এটি তার চারপাশের সব কিছু শুষে নেয়। এর ঠিক বিপরীত হচ্ছে শ্বেত গহ্বর। কিন্তু যদি এ দুটো বিপরীত ধর্মী বস্তু সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন কি ঘটবে?

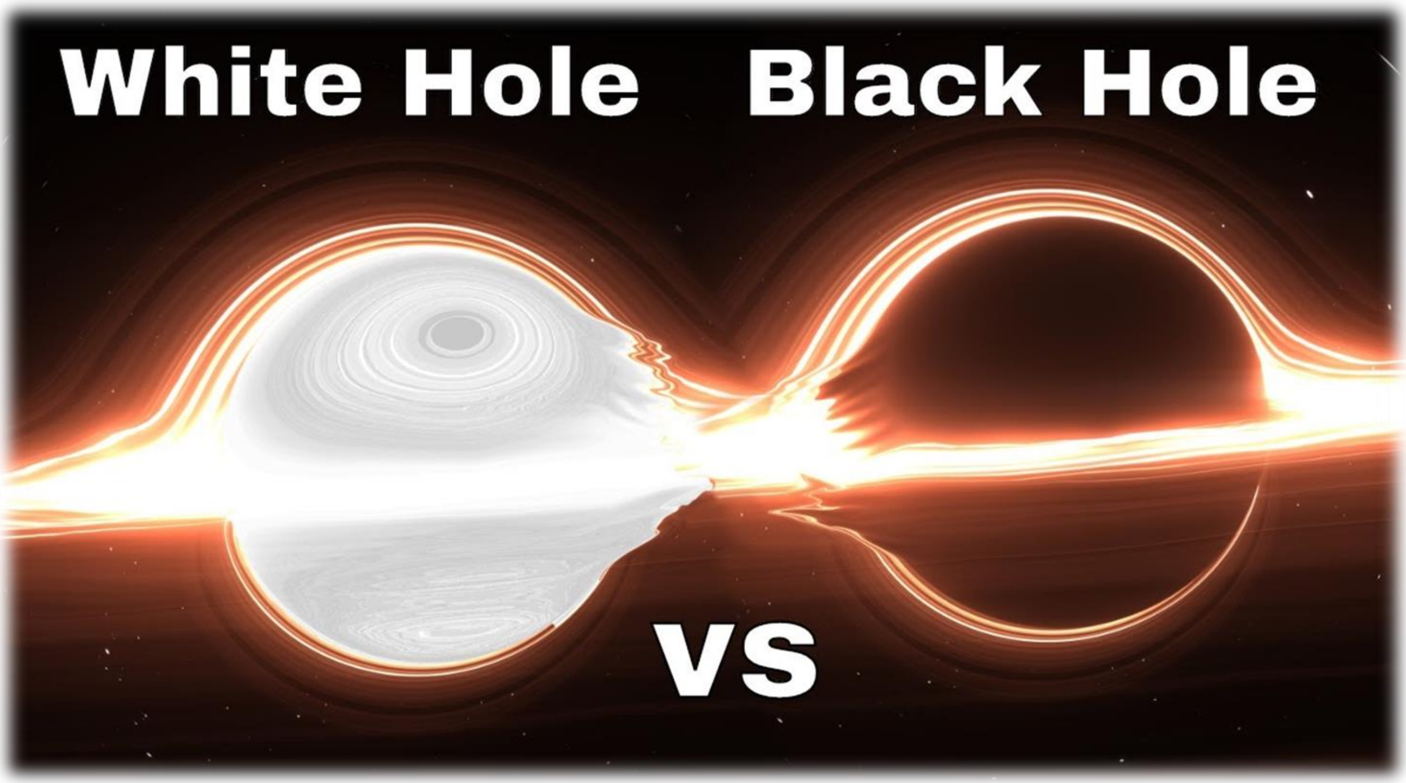

এ ধারণাটি ক্রুস্কল ডায়াগ্রামে ভালভাবে বুঝা যায়। kruskol-Szekeres স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক ধরণের তুল্য সিস্টেম যা Schwarzschild জ্যামিতিতে কৃষ্ণ গহ্বরের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তুল্য সিস্টেমের একটি বড়ো সুবিধা হচ্ছে, এটি পুরো স্পেসটাইমকে অনেকাংশে কভার করে এবং শারীরিক একতার বাইরেও যে কোন জায়গায় ভালো আচরণ করে। [3]

উপরের গ্রাফের শ্বেত গহ্বর অংশ IV এবং এই অঞ্চলের বাইরে কোন আলো তাত্ত্বিকভাবে প্রবেশ করতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন এক অঞ্চল যেখানে কোন কিছু তাত্ত্বিকভাবে প্রবেশ করতে

পারে নি, কেবল সেই অঞ্চল থেকে কণা বেড়িয়ে আসতে পারে। সুতরাং শ্বেত গহ্বরের সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি শ্বেত গহ্বর একটি কৃষ্ণ গহ্বরের সাথে সংঘর্ষ করতে পারে না(চিত্রের দ্বিতীয় অঞ্চল)। [4]

শ্বেত গহ্বর মূলত একটি সময় বিপরীত কৃষ্ণ গহ্বর। তাত্ত্বিকভাবে শ্বেত গহ্বরের উপস্তিথির প্রমাণ পাওয়া গেলেও শ্বেত গহ্বরের অস্তিত্বে কিছু সমস্যা আছে। যেমন এটি তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে মানে না। তাছাড়া যদিও শ্বেত গহ্বর থাকেও সেটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। শ্বেত গহ্বর একটি তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র। আমরা এখন ও এটি সম্পর্কে ভালভাবে জানি না। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে শ্বেত গহ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ আবিষ্কার করবো আমরা।

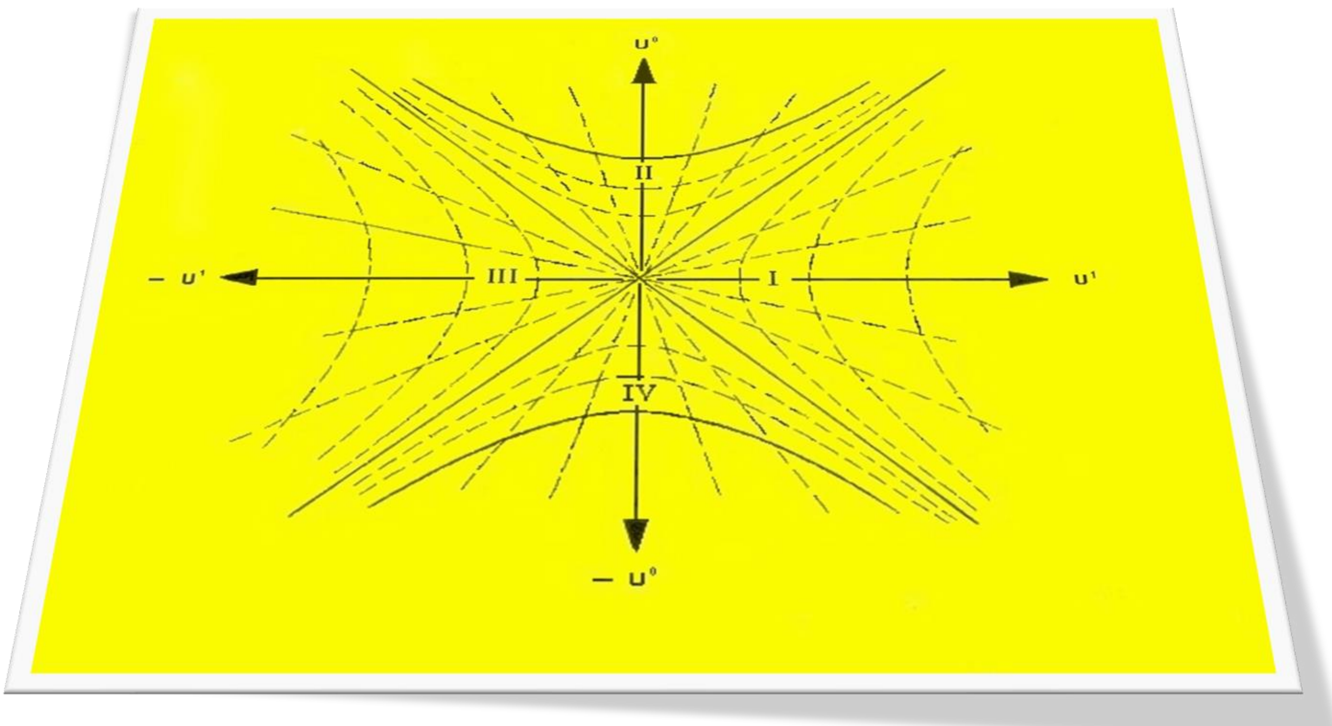

সূত্র: [1] https://bit.ly/3dsrzhn, [2] https://bit.ly/3fuUSSR, [3] https://bit.ly/3fD4z1w, [4] https://bit.ly/3wgVCB1